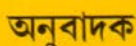


(বৌদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য)

এগার্টন সি. ব্যাপটিস্ট



অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী

## গ্রন্থ পরিচয়

বর্তমান গ্রন্থ ‘ভবচক্র’ মূলত Egerton. C. Baptist বিরচিত ও Planes of Existence—Wheel of life গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার অতি যত্ন সহকারে মনুষ্যালোক সহ একত্রিংশৎ সত্ত্বলোক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ৩১ প্রকার সত্ত্বলোক হচ্ছে :

১। ব্রহ্মালোক—	১৬
২। অরূপ ব্রহ্মালোক—	৪
৩। দেবলোক—	৬
৪। মনুষ্যালোক—	১
৫। অপায়লোক—	৪

৩১

বুদ্ধবাণীর সঙ্গে নিজের গবেষণালবদ্ধ অনুভূতিকে যোগ করে গ্রন্থকার আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। অপায়লোক, মনুষ্যালোক, দেবলোক, রূপ-ব্রহ্মালোক, অরূপ-ব্রহ্মালোক—বিশেষত বিভিন্ন স্বর্গ ও নরকের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা গ্রন্থকার দিয়েছেন তদ্বারা সংশয়বাদীদের যে কোন সংশয় দূরীভূত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন লোকের যে একটি ভ্রান্তধারণা আছে—‘মনুষ্যালোক ছাড়া আর কোন সত্ত্বলোক নেই’—এই গ্রন্থের দ্বারা সেই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হতে বাধ্য। ভূমিকা-লেখক প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অগ্নমহাপণ্ডিত বি. আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থের যথার্থই বলেছেন—‘এই গ্রন্থ লেখকের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি।’

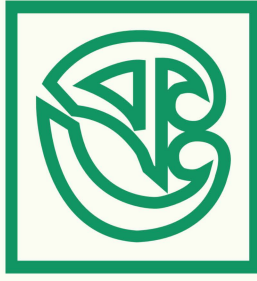
এই গ্রন্থ বিশ্বের বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ সকলের নিকট এক নতুন আলোর সন্ধান দেবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

## গ্রন্থকার পরিচিতি

১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীলংকার পাণ্ডুবম্বুর ইলেকটোরেট-এ Egerton. C. Baptist মহোদয়ের জন্ম হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। মাতার অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হন। তিনি জন্মসূত্রে একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক হলেও তাঁর মনে প্রবল জাগে কেন তাঁর মাতার অকালমৃত্যু হল। তাঁর জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট করে। ফলে দীর্ঘকাল ধরে তিনি বুদ্ধের ‘ধর্ম’ নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। অবশেষে তিনি মাননীয় বিতিয়ালা ধর্মালংকার নায়ক থেরোর নিকট থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

তিনি একজন বিদেশী (হল্যান্ডবাসী) হলেও অল্পদিনের মধ্যে বৌদ্ধদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন এবং বুদ্ধের ধর্মের দুর্বোধ্য বিষয়ের উপর গবেষণালব্ধ মূল্যবান রচনা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং শ্রীলংকার বেতার ও দূরদর্শনে বুদ্ধবাণীর সম্প্রচারক ছিলেন। যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা হল “Nibbana or The Kindom?” তাঁর “Supreme Science of the Buddhist” এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে জাপানী ভাষায় সেটার অনুবাদ হয়েছে। পালি অভিধম্ম পিটকের দুর্বোধ্য বিষয়ের উপর তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে “Abhidhamma For the Beginner” বিদ্যার্থী ও গবেষকদের নিকট একটি গাইড-বুক রূপে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের উপর তাঁর গবেষণাপ্রসূত রচনা পাঠ করে অনেক অ-বৌদ্ধও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণও করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থ ‘Planes of Existence—wheel of life’ যার বঙ্গানুবাদ ‘ভবচক্র’ লেখকের ১১তম গ্রন্থ।



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# ভ ব চ ক্র

(বৌদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য)

একত্রিংশৎ প্রকার ভব বা সত্ত্বগণের  
উৎপত্তি বা পুনর্জন্মের স্থান

গ্রন্থকার

এগার্টন সি. ব্যাপটিস্ট

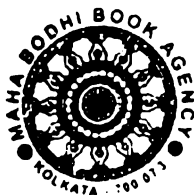
: ভূমিকা :

ভদন্ত অন্নমহাপণ্ডিত

বি. আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থের

: অনুবাদক :

অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী



মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কোলকাতা-৭০০ ০৭৩

২০১০

**BHAVACAKRA**

**Written by**  
**EGERTON C. BAPTIST**

**Bengali Translation :**  
**by Dr. Sukomal Chaudhuri**

**@ Publishers**  
**First Published 2010**

**Published by :**  
**D.L.S. Jayawardana**  
**Maha Bodhi Book Agency**  
**4-A, Bankim Chatterjee Street**  
**Kolkatta 700 073**  
**Ph : 2241-9363**  
**(M) 9831077368**

**Printed at :**  
**Sagarika Press**  
**9, Antony Bagan Lane**  
**Kolkata-700 009**

**Price : 75.00 only**

**ISBN 978-93-80336-03-9**

**ভবচক্র**

**এগার্টন সি. ব্যাপটিস্ট**  
**দ্বারা প্রণীত**

**বাংলা অনুবাদ :**  
**ড. সুকোমল চৌধুরী**

**স্বত্বাধিকারী : পাবলিশার্স**  
**প্রথম প্রকাশ ২০১০**

**প্রকাশক :**  
**ডি. এল. এস. জয়বর্ধন**  
**মহাবোধি বুক এজেন্সি**  
**৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট**  
**কোলকাতা ৭০০ ০৭৩**  
**দূরভাষ : ০৩৩-২২৪১-৯৩৬৩**

**মুদ্রক :**  
**সাগরিকা প্রেস**  
**৯, এন্টনি বাগান লেন**  
**কোলকাতা-৭০০ ০০৯**

**মূল্য : ৭৫ টাকা মাত্র**

## অনুবাদকের দুটি কথা

‘31 Planes of Existence — Wheel of Life’ গ্রন্থখানি আকারে ছোট হলেও অতি মূল্যবান গ্রন্থ। যেসকল বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তা বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকদের অধিকাংশেরই জানা নেই, অথচ জানা প্রয়োজন, বিশেষ করে বৌদ্ধদের। তাই আমি বহুজনহিতায় এই গ্রন্থের অনুবাদের কাজে হাত দিই। গ্রন্থকার Egerton C. Baptist একজন স্বনামধন্য লেখক। তিনি অতি যত্ন সহকারে মনুষ্যালোক সহ একত্রিংশৎ সত্ত্বলোক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের মানুষ এমনকি অনেক বৌদ্ধরাও স্বীকার করতে চান না যে, মনুষ্যালোক ব্যতিরেকেও আরও ত্রিংশৎ (৩০ প্রকার) সত্ত্বলোক আছে। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তথাগতের বচন মিথ্যা হতে পারে না। পালি সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থকার বিভিন্ন পালি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। যিনি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বোধিসত্ত্ব অগ্নমহাপণ্ডিত বি. আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থের। তিনি একবাক্যে স্বীকার করেছেন—‘এই গ্রন্থ লেখকের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি।’ বাস্তবিকই স্বল্প পরিসরে গ্রন্থকার মনুষ্যালোক সহ একত্রিংশৎ প্রকার সত্ত্বলোকের যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। বুদ্ধবাণীর সঙ্গে নিজের গবেষণালব্ধ অনুভূতিকে যোগ করে তিনি আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। অপায়লোক, মনুষ্যালোক, দেবলোক, রূপব্রহ্মলোক, অরূপব্রহ্মলোক, বিশেষতঃ বিভিন্ন স্বর্গ ও বিভিন্ন নরকের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা গ্রন্থকার দিয়েছেন তদ্বারা সংশয়বাদীদের যে কোন সংশয় নিরসন হতে বাধ্য। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন লোকের যে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে—

‘মনুষ্যলোক ছাড়া আর কোন সত্ত্বলোক নেই’—এই গ্রন্থের দ্বারা তা দূরীভূত হতে বাধ্য।

লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল বলে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আমি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইনি। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশান ঘোষ মহাশয় তাঁর জাতকের বঙ্গানুবাদে (৬ খণ্ডে প্রকাশিত) নিম্ন জাতকের যে বর্ণনা দিয়েছেন আমি তার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি—আমার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। পালি গাথাগুলোর বঙ্গানুবাদ ঈশান ঘোষ মহাশয় অতি সুন্দর কবিতার ছন্দে সুখপাঠ্য করে পরিবেশন করেছেন। তাঁর অনুবাদকে বিকৃত করলে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা অসম্মান জ্ঞাপন করা হবে। তাই আমি ঐ অনুবাদ অবিকৃত রেখে এই গ্রন্থে পরিবেশিত করেছি। আমি সন্তুষ্টচিত্তে ঈশান ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিতে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।

আমি আশা করবো—এই গ্রন্থের দ্বারা পাঠক সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। মহাবোধি বুক এজেন্সীর স্বত্বাধিকারিগণ, বিশেষতঃ শ্রীমান জয়দেব এই গ্রন্থ প্রকাশিত করার দায়িত্ব নিয়ে সকলের ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইতি

শ্রীসুকোমল চৌধুরী

কোলকাতা, রথযাত্রার পূর্ণ্যতিথি

২৪শে জুন, ২০০৯



## ভূমিকা

সাধারণ লোক যাঁর কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশুনো নেই, অথচ কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান আছে, তিনি কিন্তু প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল। তিনি প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষদের শিক্ষাকে সম্মান করেন যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে প্রজ্ঞার উন্নততম শিখরে আরোহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা তথাকথিত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছেন এবং ধার করা ‘বৈজ্ঞানিক ভাবধারা’ মস্তিষ্কে জমা করে রেখেছেন— তাঁরা প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষদের বাণীকে সমালোচনা করার দুঃসাহস করেন এবং যে সব বিষয়কে তাঁরা ‘বৈজ্ঞানিক’ বলে মনে করেন তার বিপরীত কোন কিছুকে তাঁরা মানতেই রাজী নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদির অস্তিত্বকে মানতে চান না। তাঁরা বলেন—‘ঐ সব বিষয় বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি’। তাঁরা বোঝেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞান এখনও এতটা উন্নত হয়নি যে ঐ সব রহস্যের মোকাবিলা করতে পারে। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক ঐসব বিষয়কে অস্বীকারও করেন না, আবার গ্রহণও করেন না। তিনি ঐসব বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চান এবং তিনি অকপটে একথা স্বীকার করেন যে তিনি এখনও ওসব বিষয় আবিষ্কার করতে পারেন নি। বিজ্ঞান হচ্ছে একটা গতিশীল (dynamic) প্রক্রিয়া। ইহা সত্যত পরিবর্তনশীল, প্রতি বছরেই পরিবর্তিত হয়। ১১শ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ১২শ শতকের বৈজ্ঞানিকরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ১৯ শতকের বৈজ্ঞানিকরা বললেন যে পরমাণু হচ্ছে চরম দ্রব্য যা অবিভাজ্য। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন যে পরমাণুও বিভাজ্য। এভাবে আমরা দেখছি যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর যে সিদ্ধান্ত একদিন চরম সত্য বলে প্রশংসা

পেয়েছিল, আজকে তা ধুলায় মিশে গেছে। অতএব প্রাচীন সিদ্ধপুরুষদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে তড়িঘড়ি বাদ দেওয়া উচিত নয় যেহেতু সেগুলো হয়ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না। ঐসকল সিদ্ধপুরুষ যাদের ভারতীয় পারিভাষিক শব্দে ‘ঋষি’ বলা হয়—যাঁরা তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করেছেন, দীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উৎকৃষ্ট করেছেন, তাঁদের সেই সকল গভীর তত্ত্বকে আমরা এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারি না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মানবজীবনের স্থূল আধিভৌতিক দিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ আরও অনেকটা অগ্রসর হয়ে মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকটাই বিশ্লেষণ করেছেন।

যদিও এই পৃথিবী সম্বন্ধে ভূবিদ্যা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কিন্তু অনেকদূর এগিয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং এমন ভূগোল আবিষ্কার করেছেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন যে আমাদের এই পৃথিবীর বাইরেও অনেক জগত আছে যেগুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই নেই। যেমন, এই পৃথিবীর বাইরে দেবলোক আছে, ব্রহ্মলোক আছে, প্রেতলোক আছে ইত্যাদি। অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ মনশ্চক্ষুকে সাধনার দ্বারা উন্নত করতে পারলে যে কেউ ঐ সকল দেবলোকের চাক্ষুষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। Sir Oliver Lodge-এর মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ব্যক্তিগতভাবে তা উপলব্ধি করেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘মেরু’ পর্বতের উল্লেখ আছে। অবশ্য কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতও বলেছেন যে ‘মেরু’ অলীক, অবাস্তব। ‘মেরু’ শব্দের দ্বারা সুমেরু (North Pole), হিন্দুকুশ পর্বত, হিমালয়ের একটি শাখা, Tartary ভাষায় ‘Merv’, পৃথিবীর অক্ষরেখা, মনুষ্য দেহের কঙ্কালের মেরুদণ্ড (যোগ-পদ্ধতির পারিভাষিক শব্দ) এবং ঐজাতীয় অনেক কিছুর কথা প্রাচীন মুনি-ঋষিরা ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের লেখকগণ ‘মেরু’ শব্দের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যতপ্রকার মেরুর বর্ণনা আছে সবগুলোকে একই মেরুর অন্তর্গত করেছেন। যার ফলে নতুন ‘মেরু’র সৃষ্টি হয়েছে যার কোন অস্তিত্ব নেই। ঐ ভুল পরবর্তীকালে হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধ লেখকরাও করে গেছেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে ‘মেরু’ নামক কোন পর্বত নেই। ঐ নামে অনেক পর্বত আছে। অঙ্গুস্তর নিকায়ে ‘সন্তসুরিয়ুগ্গমন সুত্তে’ বুদ্ধ এই ‘মেরু’র কথা বলেছেন। এখানে ‘মেরু’ শব্দের দ্বারা কোন স্থূল বস্তুকে বোঝায়নি। যেমন

হিমালয় বা অন্যান্য পর্বতমালা। ‘মেরু’ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে বিশাল এক নক্ষত্রপুঞ্জ যা ‘ধ্রুবতারা’ অবধি বিস্তৃত, যা পৃথিবীকে বেষ্টিত করে আছে, যার মধ্যস্থান চওড়া এবং দুই প্রান্তে সংকীর্ণ। ঋষি ব্যাস-বিরচিত পতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রের টীকাতে এর বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা আছে জ্যোতিষ্মমণ্ডলীর পর্বতরূপে। এমন অনেক কিছুই আছে যা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যেগুলো বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলো মুনি-ঋষিরা তাঁদের যৌগিক দৃষ্টিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।

Mr Egerton C. Baptist তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে এসব বিষয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যতটা সম্ভব যুক্তি দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেবলোক ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন এবং যাঁদের মনে এখনও ঐসব দেবলোক, ব্রহ্মলোক, অপায়লোক সম্বন্ধে সংশয় আছে তাঁদের সেই সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থ লেখকের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি।

বিশ্বের পাঠক সমাজের নিকট Mr Baptist এর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি গ্রন্থকার হিসাবে সর্বজনবিদিত, বৌদ্ধধর্মের উপর তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

অন্নমহাপণ্ডিত বি. আনন্দমৈত্রায়  
মহানায়ক থের

চন্দ্রসেকেরাম

আনন্দমৈত্রায় মবাথা,

মহরগাম,

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

শ্রীলংকা

## মুখবন্ধ

বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে যে অপায়লোকের কথা আছে (যেমন তির্যক্, অসুর, প্রেত, নিরয়) অনেক বৌদ্ধরাও তা স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন যে, নারকীয় দুঃখ এই মনুষ্যালোকেই লোকে ভোগ করে। কারণ তাঁরা দেখেন যে, মনুষ্যালোকের মধ্যেই কমবেশি সত্ত্ব দেখা যায় যারা কুৎসিত-দর্শন, পঙ্গু, মুক, বধির, অন্ধ, দরিদ্র ইত্যাদি। তাঁরা স্বর্গের বা দেবলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না যেখানে সত্ত্বগণ শুধু আনন্দ এবং দিব্য সুখই উপভোগ করে। তাঁদের মধ্যে স্বর্গের স্থান এই পৃথিবীতেই। কারণ তাঁরা মনুষ্যদের মধ্যে দেখেন কেহ কেহ ধনী, সু-লালিত-পালিত, সুখী—যাঁদের কোন দুঃখ নেই। তাই তাঁরা মনে করেন ‘স্বর্গ’ এবং ‘নরক’ এই পৃথিবীতেই আছে, অন্য কোথাও নয়। তাঁরা এটুকু বুঝতে চান না যে, মানুষ বর্তমান জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তা কিন্তু অতীতের দুষ্কৃতির ফলেই। সংসারাবর্তে বারবার ঘুরতে ঘুরতে তারা কত না দুষ্কর্ম সম্পাদন করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তদ্রূপ তারা এটুকুও বুঝতে চায় না যে, মানুষ বর্তমান জন্মে যে সুখ-শান্তি-ভোগ করছে তাও অতীতের সুকৃতির ফলেই। এটা নয় যে এই মনুষ্যালোক কারও জন্য বিরাট স্বর্গ, আবার কারও জন্য মহানরক।

তথাপি বিভিন্ন ব্যক্তি যা-ই মনে করুন না কেন (কারণ মানুষ ত স্বাধীনচেতা), বৌদ্ধধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের মধ্যে যে দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-সুখ দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দ-সুখ অমনুষ্যালোকে দেখা যায়। আমি তাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে, কোন কোন অবস্থায় অর্থাৎ কি কি পাপ-পুণ্যের কারণে মানুষ মনুষ্যালোকে জন্ম নেয়। যাঁরা সংশয়বাদী তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, মনুষ্যভূমিই একমাত্র স্থান নয়, যেখানে সুখ এবং দুঃখ আছে, অমনুষ্যালোকও (দেবলোক এবং অপায়লোক) আছে যেখানে অতীতের কর্মের গুরুত্ব অনুসারে মানুষ সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে আবার দুর্গতি নরকে জন্মগ্রহণ করে।

আমাদের পৃথিবীর ঠিক উপরে আছে চতুর্মহারাজিক দেবলোক (অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এই চতুর্দিকের চারজন অধিপতির দেবলোক) —চারজন অধিপতি হচ্ছেন উত্তরে কুবের, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র এবং পশ্চিমে বিরূপাক্ষ মহারাজ এবং তাবতিংস দেবলোক (দেবরাজ শক্রের রাজ্য)। এছাড়া এক শ্রেণীর অসুর আছেন যাঁরা পূর্বে দেবতা ছিলেন। পরে শক্রের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে স্বর্গের অন্যদিকে বাস করেন যার নাম অসুরলোক যা মহামেরুর পাদদেশে অবস্থিত। এই অসুরগণ কিন্তু অপায়লোকের অসুরগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তারা এক প্রকার প্রেত, কিন্তু অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অসুখী। অন্যদিকে অসুর-দেবগণ ত্রিহেতুক সুখী সত্ত্ব যাঁরা স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় সমস্ত প্রকার আনন্দ এবং সুখ উপভোগ করে। এই কয়টি দেবভূমির সঙ্গে পৃথিবীর নিকট সম্পর্ক আছে। অন্যান্য দেবভূমি (যেমন যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবশবর্তী) যদিও কাম-দেবলোকের অন্তর্গত, সেগুলো পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মলোক এবং অরূপ ব্রহ্মলোক আরও দূরে অবস্থিত। নিরয়গুলো পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশে অবস্থিত। কিন্তু উস্‌সদ নিরয়গুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের খুব নিকটে অবস্থিত। এখানে যে যমরাজের কথা বলা হয়েছে তা হিন্দুশাস্ত্রের যমরাজ থেকে স্বতন্ত্র। এখানে যমরাজ হচ্ছে ‘বেমনিক প্রেত’। প্রত্যেক যমরাজ ২ সপ্তাহ রাজত্ব করেন এবং ঐ ২ সপ্তাহ তিনি দেবরূপেই থাকেন। পরের ২ সপ্তাহ তিনি প্রেতের ন্যায় দুঃখ ভোগ করেন। তাঁর অবর্তমানে আর একজন বেমনিক প্রেত (যার বিমান আছে) তাঁর স্থান অধিকার করেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাইনা কেন—একথা কেউ কেউ বলতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে—মনুষ্য হচ্ছে পঞ্চমাত্রিক সত্ত্ব, নিরয়ের মতো পঞ্চমাত্রিক এবং চতুর্মাত্রিক সত্ত্বগণকে তাঁরাই দেখতে পান যাঁরা অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কামলোক, রূপলোক এবং অরূপলোক বলতে বোঝায় এই সৌরজগতের যে পৃথিবী উপগ্রহ তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সত্ত্বাবাসসমূহ। অন্যান্য সৌরজগতেও সত্ত্বাবাস আছে, কিন্তু ঐ সকল সৌরজগতের কেবল ‘পৃথিবী’তেই সত্ত্বাবাস আছে, অন্যান্য গ্রহ যেমন বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ইত্যাদিতে সত্ত্বাবাস নেই। আমি অবশ্যই বলতে চাই যে প্রত্যেক সৌরজগতের একটি পৃথিবী উপগ্রহ আছে, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, অন্যান্য উপগ্রহে যা নেই।

গ্রন্থে ‘গাবুত’ শব্দের উল্লেখ হয়েছে। ‘গাবুত’ বলতে বোঝায় প্রাচীন ভারতে প্রচলিত দূরত্বের পরিমাপসূচক শব্দ। বৈদিক যুগ থেকে এই শব্দটি আমাদের নিকট চলে আসছে। ‘গাবুত’ হচ্ছে (পালি সাহিত্যানুসারে) দুই মাইলের চেয়ে কিছু কম, এক যোজনের এক-চতুর্থাংশের কিছু কম।

আমি Balangoda-র আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থেরোর নিকট কৃতজ্ঞ যেহেতু তিনি এই গ্রন্থের শুধু ভূমিকাই লিখে দেননি, অনুবাদ করার সময় পালি অট্ঠকথার অনেক ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থেরোকে বর্তমান যুগের ‘বুদ্ধঘোষ’ বলা যেতে পারে—অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অধিকার। ধর্ম হচ্ছে বহুমুখযুক্ত প্রিজমের (Prism) মতো এবং শ্রদ্ধাস্পদ বিশিষ্ট পণ্ডিত হুবির বৌদ্ধশাস্ত্রে নিপুণ এবং ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বুদ্ধঘোষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। অধিকন্তু, ভগবান বুদ্ধ যেমন ছিলেন উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলের নিকটই সমানভাবে সহজগম্য, এই আনন্দমৈত্রেয় মহানায়ক থেরও সকলের নিকট সহজগম্য ছিলেন, ফলভারে নত বৃক্ষ থেকে যেমন ছোটো ছোটো শিশুরা ফল আহরণ করতে পারে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় ৩০ বৎসরের সম্পর্ক। একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই, অন্যদিকে শিশুসুলভ মনোভাব, সৌম্য, শান্ত, দান্ত—যেন একজন বোধিসত্ত্ব। আমি যে পথের পথিক অর্থাৎ বুদ্ধত্বলাভ, জানিনা তিনিও সে পথে চলেছেন কিনা। সময় একদিন সব বলে দেবে।

কৃতজ্ঞচিহ্নে আমি এই গ্রন্থখানি Dr. E. R. Abeyesundere-র মহীয়সী ধর্মপত্নী পরলোকগতা Mrs. Lilian Ellen Abeyesundere-র নিকট উৎসর্গ করছি, যিনি বহু বৎসর ধরে আমার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা করে আসছেন। আমি তাঁর নির্বাণশান্তি কামনা করি। এখানে আমি Dr. E. R. Abeyesundere মহাশয়কেও ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য যিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছেন। এই ধর্মদানের আনিসংস (পুণ্যফল) তিনিও লাভ করুন।

ত্রিরত্নের আশীর্বাদধন্য শ্রীলংকার রক্ষাকারী দেবগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বহু গ্রন্থ রচনা করেছি—এই ধর্মদানের অনেকাংশ আমি তাঁদের দান করছি। এই পুণ্যকাজের ফলে আমি যেন ভবিষ্যতে কোন জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করে চরম মুক্তির আনন্দ লাভ করতে পারি। অন্যান্য যারা আমার কাজে

সাহায্য করেছেন তারাও যেন আমার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সময় আমার সঙ্গেই থাকেন। কারণ এখন আমি তাঁদের যা দিতে পারছি সেটা হচ্ছে এক ‘চুমুক’ মাত্র, তখন আমি তাদের দিতে পারবো ‘সমুদ্র’।

পরিশেষে আমি আমার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাঁরা যেন বোঝেন যে সংসারে সবই অনিত্য—তাদের উৎপত্তি হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজীবনও দুর্লভ। জগতে বুদ্ধগণের আবির্ভাব আরও দুর্লভ। কারণ এক বুদ্ধের তিরোধান এবং আর এক বুদ্ধের আবির্ভাব—এর মাঝখানে কল্পকাল কেটে যায়। যেমন বর্তমান গৌতম বুদ্ধের তিরোধান হয়েছে। ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়। মাঝখানে এক লক্ষ কল্পের ব্যবধান। এই যুগটা হবে সম্পূর্ণ অন্ধকারের যুগ। কারণ খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি বুদ্ধত্বের অভিলାষী। অসংখ্য কল্পকাল ধরে পারমিতা পূর্ণ করার মতো দুর্ধর্ষ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালে মানুষ বুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য অনেক কিছুর শরণ গ্রহণ করবে।

‘মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করা দুষ্কর  
জীবিকার্জনও দুষ্কর  
সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ  
বুদ্ধের আবির্ভাবও দুর্লভ।’

ভীত সম্ভ্রান্ত হয়ে মানুষ পর্বত, গুহা, বন-জঙ্গল, বৃক্ষ, চৈত্য ইত্যাদির শরণ নেবে।

অনিত্য নীতি অনুসারে বুদ্ধ ২৫০০ বৎসর পূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আগামী ২৫০০ বৎসরে ধর্মও লুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্ম কি কি কারণে লুপ্ত হবে?

- ১। যখন ভিক্ষুরা তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান দেখাবে না।
- ২। যখন সমর্থ ও বিপস্সনা ভাবনার প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না।
- ৩। যখন ভিক্ষুরা বিনয় মানবে না।
- ৪। অতিরিক্ত শিক্ষার কারণে যখন ভিক্ষুরা ঈশ্বরকেই জ্ঞানের আধার বলে মানবে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই সকল ধ্বংসের নিমিত্ত শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছি।

আমাদের উচিত ধর্মকে জানা কারণ এটা এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ B. Anandamaitreya-র মতো অনেক প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ভিক্ষুরা আছেন যাঁরা আমাদের শিক্ষা দিতে পারেন, আমরা তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে পারি। আসুন এইভাবে ধর্মকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাই—এই প্রার্থনা করে আমি আমার মুখবন্ধ শেষ করবো এই বলে—

‘সবের সম্ভা সুখিতা হোস্ত’।

EGERTON C. BAPTIST

No. 3, First Lane  
Kirillapone  
Colombo 5  
April 27, 1981  
Srilanka



নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ

## ভবচক্র

(বৌদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য)

### একত্রিংশৎ প্রকার ভব বা সত্ত্বগণের উৎপত্তি বা পুনর্জন্মের স্থান

এই ছোটো গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে সত্ত্বগণের উৎপত্তিস্থান ও পুনর্জন্মস্থান নিয়ে আলোচনা করবো। থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম মতে মানুষ মৃত্যুর পর আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যালোকই একমাত্র স্থান নয় যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর আবার এখানেই জন্মগ্রহণ করে। মানুষ মৃত্যুর পর যদি আবার মনুষ্যালোকেই জন্মগ্রহণ করে, তাহলে কোন কোন মানুষ পুনর্জন্মের কথা (এক জন্ম, দুই জন্ম, বহু জন্ম) স্মরণ করতে পারে। কিন্তু গত মনুষ্যজন্ম এবং বর্তমান মনুষ্যজন্মের মধ্যে ব্যবধান থাকা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই মানুষ আবার মনুষ্যালোকেই জন্ম নেবে—একথা সব ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। তাহলে মনুষ্যালোকে মৃত্যু এবং মনুষ্যালোকে পুনর্জন্ম-এর মাঝখানে মানুষ কোথায় জন্ম নেয়? বলা হয়েছে ঐ ‘অন্তরাভবে’ তারা তির্যক, প্রেত, অসুর বা নিরয়লোকে জন্মগ্রহণ করে বহুকাল অতিবাহিত করতে পারে, যতদিন না তারা পুনরায় মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করে। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে কর্ম। কর্ম অনুসারেই (অর্থাৎ ভালমন্দ কর্ম) মানুষ চারি অপায়লোকে (তির্যক আদি) জন্মগ্রহণ করে—অর্থাৎ কখনও বা তির্যকলোকে, কখনও বা প্রেতলোকে, কখনও বা অসুরলোকে, কখনও বা নিরয়লোকে (নরকে) পরিভ্রমণ করতে করতে আবার মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হয়। মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করা দুষ্কর এবং দুর্লভ। একবার বুদ্ধ আঙুলের ডগায় কিঞ্চিৎমাত্র বালি নিয়ে শিষ্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন—“আমার আঙুলের ডগায় যে বালি আছে তার পরিমাণ বেশী না পৃথিবীর সমগ্র বালুকারাশির পরিমাণ বেশী?”

শিষ্যগণ উত্তরে বললেন—“প্রভু, আপনার আঙুলের ডগায় কিঞ্চিৎমাত্র বালি আছে, এই বিশাল পৃথিবীতে যা বালুকারাশি আছে তা অপরিমেয়।”

ভগবান বুদ্ধ বললেন—“হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যারা সুগতি স্বর্গলোকে

জন্মগ্রহণ করে তাদের সংখ্যা আমার আঙুলের ডগার বালির মতো। আর যারা চারি অপায়লোকে জন্মগ্রহণ করে তাদের সংখ্যা এই মহাপৃথিবীর বালুকারাশির মত, অনন্ত, অপরিমেয়।”

বুদ্ধ আরও বলেছেন কেন আমরা অতীতের জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি না। তার কারণ বর্তমান মনুষ্যজন্ম এবং অতীতের মনুষ্যজন্মের মাঝখানে হয়ত আমরা মনুষ্যালোকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে পারিনি। বর্তমান মনুষ্যজন্ম এবং অতীতের মনুষ্যজন্মের মধ্যে যে ব্যবধান তা আমাদের অতীত জন্মের স্মৃতিকে মুছে দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কারা যারা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে এবং পূর্বজন্মের কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারে? তাঁরা কি যাঁরা বর্তমান মনুষ্যজন্মের ঠিক আগের জন্মে মনুষ্য হয়েছিলেন এবং যাঁদের সেই জন্মে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকতেই অকালমৃত্যু বরণ করেছিলেন? বর্তমান মনুষ্যজন্ম এবং ঠিক আগের মনুষ্যজন্মের মধ্যে ব্যবধান যদি খুবই সামান্য হয়, ঐ সকল বিরল দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই কেবল কোন কোন ব্যক্তি অতীত জন্মের কোন কোন ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারে।

### মনুষ্যজন্ম দুর্লভ!

সেই প্রায়াক্ষ কচ্ছপের গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। সেই কচ্ছপ পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্রে, পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্বসমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় এবং কালে কালে (শতবর্ষান্তে) একবার মস্তক উত্তোলন করে এবং ভাসমান একছিদ্র যুক্ত যুগ (= জোয়াল) এর ছিদ্রে গ্রীবা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করে নিষ্ফলভাবে। (কদাচিৎ সে গ্রীবা প্রবেশ করাতে পারে বহু যুগের পরে)। মনুষ্যজন্মও তদ্রূপ দুর্লভ।

সূত্রে বলা হয়েছে—

‘ভিক্ষুগণ, যেমন কোন পুরুষ এক ছিদ্রযুক্ত যুগ (= জোয়াল) মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করল। সেই স্থানের এক একচক্ষু কচ্ছপ শতবর্ষান্তে একবার মস্তক উত্তোলন করে।

‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? ঐ একচক্ষুক কচ্ছপ শতবর্ষান্তে একবার যখন মস্ত উত্তোলন করে, সে কি ঐ এক ছিদ্রযুক্ত যুগে (= জোয়ালে) প্রত্যেকবার স্বীয় গ্রীবা প্রবেশ করাতে পারবে?’

‘ভদন্ত! যদি পারে তা হলে দীর্ঘকাল পরে কদাচিৎ কখনও (অর্থাৎ মাঝেমধ্যে) করতে পারে।’

‘ভিক্ষুগণ, ঐ কানা কচ্ছপের পক্ষে একছিদ্রযুক্ত যুগে গ্রীবা প্রবেশ করানো যেরূপ দুর্লভ, বিনিপাতগ্রস্ত মূর্খের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ তদপেক্ষাও দুর্লভ।’

অন্য একটি সূত্রে বুদ্ধ ভগবান বলেছেন:

“হে ভিক্ষুগণ, যেমন এই জম্বুদ্বীপের খুব সামান্য অংশেই ভাল ভাল উদ্যান, কুঞ্জবন, চাষের জমি এবং সরোবরাদি আছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উঁচু-নীচু অনুর্বর জমি, গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া অসংখ্য নদী, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের দ্বারা পরিবৃত বহু স্থান, বন্ধুর ও শিলাময় প্রান্তরাদি।

‘ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, খুব অল্প সংখ্যক প্রাণী আছে যারা ক্ষিতিজ, অধিকাংশ প্রাণীই জলজ। তদ্রূপ খুব অল্প সংখ্যক সত্ত্ব আছে যারা মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করে, অধিকাংশ সত্ত্বই মনুষ্যালোকের বাইরে জন্মগ্রহণ করে।

‘তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যারা মনুষ্যালোক থেকে চ্যুত হয়, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক সত্ত্ব মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করে, অধিকাংশই দুঃখসংকুল অপায়লোকে জন্মগ্রহণ করে। যেমন তির্যক, অসুর ইত্যাদি লোকে।’

এখন বৌদ্ধধর্ম মতে একত্রিশ প্রকার সত্ত্বলোক আছে যেখানে মনুষ্যালোক থেকে চ্যুত হয়ে কর্ম অনুসারে (অর্থাৎ অতীতের পাপ-পুণ্য কর্মানুসারে) সত্ত্বগণ ভাল-মন্দ বিভিন্ন সত্ত্বলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই একত্রিশ প্রকার সত্ত্বলোকের মধ্যে চারটি হচ্ছে মহা দুঃখময় অপায়লোক, যেমন:

১। তির্যক্ লোক বা যোনি (অর্থাৎ পশু-পক্ষী-সরীসৃপ প্রভৃতি)।

২। প্রেতলোক বা যোনি (পৃথিবীর যে কোন নিভৃত স্থানই প্রেতদিগের বাসস্থান)।

৩। অসুরলোক বা যোনি (সুমেরু পর্বতের পাদদেশে অসুর-নিবাস)।

৪। নিরয় বা নরক।

‘সমস্ত কিছুই অনিত্য’ এই বৌদ্ধ মতবাদ অনুসারে স্বর্গের ন্যায় নরকও শাস্বত নয় (অর্থাৎ কোন সত্ত্ব অনন্তকালের জন্য নরকে জন্ম নেয় না এবং দুঃখভোগ করে না)। এটা অবশ্য মরণশীল সত্ত্বগণের নিকট একটা সান্ত্বনার বাক্য হতে পারে। কারণ সত্ত্বগণ অতীতের কুশল এবং অকুশল কর্মের ফলে বর্তমান জন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আবার বর্তমানের কুশল-অকুশল কর্মের উপর পরবর্তী জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। অকুশল বা পাপকর্মের ফলে ‘অপায়’ লোকে জন্মগ্রহণ করে এবং কুশল বা পুণ্যকর্মের ফলে সুগতিপ্রাপ্ত হয়।

তির্যক্-যোনি : চারি অপায় লোকের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে তির্যক্-যোনি। এটা অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পশুদের মধ্যেও অনেককে দেখা যায় যারা খুব উন্নতমানের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, আবার অধিকাংশই তদ্রূপ হয় না। কোন কোন পশু শান্ত প্রকৃতির হয় যাদের সহজেই বশে আনা যায় এবং অনুগত করা যায়, আবার অন্যরা তার বিপরীত হয়। কোন কোন পশু বন্ধুভাবাপন্ন হয়, অন্যরা ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির, দুর্দমনীয় এবং বদমেজাজি হয়। কেহ কেহ সহৃদয় প্রভুদের কাছে আদর-যত্ন পায়, উত্তম খাদ্য ও আশ্রয় পায়। নিত্য স্নান, অসুস্থ হলে ভাল ওষুধ-পথ্য লাভ

করে, অন্যরা এক টুকরো খাবারের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং জঞ্জালের স্তুপ ঘাঁটাঘাঁটি করে। প্রশ্ন হচ্ছে : পশুদের মধ্যেও কেন এত বৈসাদৃশ্য দেখা যায়? উত্তর হচ্ছে : কারণবশতঃ। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। অনাদি অনন্ত এই সংসারাবর্তে তারাও হয়ত মনুষ্যালোকে জন্ম নিয়েছিল। অতীতের সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল তাদের জন্ম-জন্মান্তর অনুসরণ করে। অতীতে যে কর্মবীজ তারা বপন করেছে তারই ফলপ্রাপ্তি এখন ঘটছে। কেন একজন পশুকুলে জন্ম নিয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পালি অভিধর্ম শাস্ত্র ‘অহেতুক-কুশল-বিপাকের’ কথা বলেছে—অর্থাৎ তিন প্রকার কুশল মূলের (অলোভ, অদোস, অমোহ) কোন একটির অবলম্বন ব্যতিরেকেই পুনর্জন্ম হতে পারে। তাদৃশ পুনর্জন্মের মূল কারণ হচ্ছে অতীতের অকুশল বা পাপ কর্ম।

প্রেত-যোনি : দ্বিতীয় অপায়লোক হচ্ছে প্রেত-যোনি। প্রেতদের জন্ম দ্বিহেতুক। কখনও কখনও বা ত্রিহেতুক। ত্রিহেতুক প্রেতরাও দেবগণের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। প্রেতরা সাধারণতঃ দুঃখময় জীবনযাপন করে—অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয়—খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অনেকটা মনুষ্যকুলের গরিব-দুঃখী মানুষদের মতো, তাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে অধিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, আবার শুক্লপক্ষে কিছুটা সুখ ভোগ করে।

কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার স্মরণে পাংশুকুল (বস্ত্র) দান করা হয়। উদ্দেশ্য হল : মৃত ব্যক্তি যদি (পুরুষ বা নারী) উলঙ্গ প্রেতরূপে জন্ম গ্রহণ করে, সে যেন তার উলঙ্গাবস্থাকে ঢাকতে পারে। এদের মধ্যে পরদত্তোপজীবী প্রেতরাই তাদের জ্ঞাতি-সুহৃদদের কৃত কুশল দানকর্মের ফল ভোগ করতে পারে।

পাঠকগণ জানলে অবাক হয়ে যাবেন যে, প্রেতরাও স্রোতাপত্তি ফল (বৌদ্ধ সাধনমার্গের প্রথম ফলশ্রুতি) লাভ করতে পারে। তারা অবশ্য ঐ সকল প্রেত যাদের জন্ম ত্রিহেতুক। পালি দীঘনিকায়ের মহানিদানসূত্রের (সূত্র সংখ্যা ১৫) অট্টকথা এবং সংযুতনিকায়ের অট্টকথাতে একরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে পিয়ংকরমাতা যক্ষিণীর কথা। একদিন ভিক্ষু অনুরুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণকালে ঐ যক্ষিণীর শিশুপুত্র কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না থামানোর জন্য যক্ষিণী বলেছিল—

“বৎস পিয়ংকর শব্দ করো না। ভিক্ষু ধর্মপদ (ধর্মকথা) আবৃত্তি করেছেন। ধর্মোপদেশ শুনে আমরা তা ভালভাবে অনুশীলন করবো। আমরা প্রাণীহত্যা করবো না। মিথ্যা কথা বলবো না। উত্তমরূপে শীল পালন করে আমরা যেন প্রেত-যোনি থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।”

যক্ষিণী তার শিশুপুত্রকে এভাবে শাস্ত করলো। বলা হয়েছে যে, ঐ দিনেই যক্ষিণী স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলেন।

অন্যটি হচ্ছে উত্তরা-মাতা প্রেতীর উপাখ্যান যিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে শুনতে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন।

নিম্ন জাতকে আমরা রাজা নিমির কাহিনীতে জানতে পারি যে, কামলোকের কিছু কিছু দেবতা অন্যদের দানাবলম্বনের প্রত্যাশী হয় যাতে তারা দানের ফল লাভ করে সুরূপ ইত্যাদি লাভ করে। এই বিষয়ে ক্ষুধার্ত প্রেতদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায়। এইজন্য তাদেরকেও প্রেত বলা হয়। এছাড়া আছে পাংশুপিশাচ যারা পাংশু বা নোংরাস্থানে জন্ম নেয়, তারা লুকিয়ে থাকে এবং মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। মচ্ছিমনিকায়ের সকুলুদায়ী সুত্তের (সুত্ত সংখ্যা ৭৯) অষ্টকথাতে তাদৃশ পাংশুপিশাচের কাহিনী জানা যায়।

বলা হয়েছে যে, একজন প্রেতী (বা যক্ষিণী) তার দুই সন্তানকে থুপারাম মন্দিরের প্রবেশপথে রেখে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। কিছু সময় অতিবাহিত হল। এই মুহূর্তে থুপারামবাসী একজন ভিক্ষু নগরে ভিক্ষাম্ন-সংগ্রহে বের হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে প্রেতীর দুই সন্তান বললো : “ভগ্নে, আপনি দয়া করে আমাদের মাকে বলবেন যেন যা খাদ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন তা নিয়ে সত্ত্বর চলে আসেন। কারণ আমরা তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছি।”

“আমি কি করে তাকে দেখবো? আমি তো তোমাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি না।” প্রেতীর সন্তানেরা তাঁকে একটি ওষধির মূল দিল। সেটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভিক্ষু হাজার হাজার রকমের প্রেতকে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। তারপর প্রেতীর সন্তানেরা তাদের মায়ের চেহারার বর্ণনা দিল। তারপর ঐ ভিক্ষু তাঁর পথে চলে গেলেন এবং যেতে যেতে তিনি কুৎসিত, বীভৎস ঐ প্রেতীকে দেখতে পেলেন যে ধৈর্য্যসহকারে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল যদি কিছু নোংরা খাবার পাওয়া যায়, বিশেষ করে সন্তান প্রসবের পর যে কদর্য, নোংরা দ্রব্য প্রসূতির গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে সেগুলো নেওয়ার জন্য। ভিক্ষু যখন তাকে তার সন্তানদের কথা বললেন, প্রেতী তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : ‘আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে?’ ভিক্ষু তখন সেই ওষধিমূল তাকে দেখালেন। প্রেতী সেটি দেখামাত্রই তা ছিনিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে আমরা এরূপ কাহিনী পাই কিভাবে যক্ষদের মৃতদেহ আবির্ভূত হয় এবং কিভাবে তারা মানুষের পুণ্যকাজে অংশগ্রহণ করে।

রাজা মিলিন্দ (ভিক্ষু নাগসেনকে) জিজ্ঞেস করলেন : ‘ভগ্নে, জগতে কি যক্ষ বলে কোন সত্ত্ব আছে?’

‘হ্যাঁ মহারাজ! যক্ষ আছে।’

‘ভস্বে, তাদের কি মৃত্যু হয়?’

‘হ্যাঁ মহারাজ, তাদেরও মৃত্যু হয়।’

‘ভস্বে, তা হলে মৃত্যুর পর তারা যে দেহ ত্যাগ করে যায়, সেগুলো মানুষেরা দেখতে পায় না কেন? তাদের মৃতদেহ থেকে কোন গন্ধই বা বের হয় না কেন?’

‘মহারাজ, তাদের শরীর দেখা যায়, গন্ধও শোঁকা যায়। তাদের শরীর কখনও কীটরূপে, কখনও পিপীলিকারূপে, কখনও বা পতঙ্গের রূপে, কখনও বা বৃশ্চিকরূপে, কখনও বা শতপদী কেম্রো বা বিছেরূপে অথবা কখনও পশুরূপে।’

‘ভস্বে, নাগসেন, এই যে ভক্তরা ভিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক কিছু দান করে এবং দানের ফল তাদের পরলোকগত আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে, আত্মীয়রা কি ঐ দানের ফল লাভ করে?’

‘মহারাজ, কেউ কেউ লাভ করে, কেউ কেউ লাভ করে না।’

‘কারা লাভ করে, কারা লাভ করে না?’

‘যারা নরকে জন্ম নিয়েছে, যারা স্বর্গে গমন করেছে এবং যারা তির্যক্-যোনিতে জন্ম নিয়েছে তারা লাভ করে না। চারপ্রকার প্রেতের মধ্যে তিন প্রকার প্রেতও লাভ করে না, যেমন,

১। প্রেত যারা বমি খেয়ে জীবন ধারণ করে (= বস্তাসিকা)

২। প্রেত যারা তীব্র ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কষ্ট পায় (= খুদ্বিপাসিনো)

৩। প্রেত যারা তৃষ্ণার দ্বারা অভিভূত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত (= নিজ্জামতংহিকা)।

কিন্তু যারা পরদন্তোপজীবী (অর্থাৎ যাদের জীবিকা পরদন্তের উপর নির্ভর করে) এবং যারা তাদের জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করতে পারে এবং তারা কি করে দেখতে পায় তারাই কেবল আত্মীয়দের প্রদত্ত দানের ফল লাভ করে এবং তার ভাগীদার হয়?’

‘ভস্বে, তাহলে এইভাবে প্রদত্ত দান কি নিষ্ফল হয় না?’

‘মহারাজ, এইভাবে প্রদত্ত দানফল নিষ্ফল হয় না। কারণ দাতারা নিজেরাই সেই দানজনিত কর্মফল ভোগ করে।’

‘ভস্বে, উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিন।’

‘মহারাজ কিছু ব্যক্তি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে আত্মীয়দের আহ্বান করে। যদি আত্মীয়রা সেই খাদ্য গ্রহণ না করে, তাহলে কি সেই খাদ্য নষ্ট-বিনষ্ট হয়ে যায়?’

‘না ভস্বে, ঐ খাদ্যের মালিকেরাই তা ভোগ করবে।’

‘তদ্রূপ, মহারাজ, যদি কোন গ্রহীতা না থাকে তাহলে দাতারা নিজেরাই ঐ দানের ফল ভোগ করবে।’

প্রেতদের মধ্যে যারা ক্ষুৎপিপাসাগ্রস্ত (যারা সব সময় তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় এবং পিপাসায় কষ্ট পায়) তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা অনেক বুদ্ধান্তর কাল ক্রমান্বয়ে ক্ষুৎপিপাসার দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েছে, উৎপীড়িত হয়েছে।

প্রেতদের মধ্যে যারা নিষ্কামতর্নহিক তারা সব সময় দেহাভ্যন্তরে অনবরত দহনজ্বালা অনুভব করে, যেমন একটি বৃক্ষের কোটরে অনবরত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

দীঘনিকায়ের দসুস্তরসুস্তের (সুস্ত সংখ্যা ৩৪) অট্টকথায় বর্ণিত হয়েছে যে, প্রেতগণ অসুরদের পুত্রের বিবাহ-উৎসবে যোগদান করে, কিন্তু কন্যার বিবাহে যোগদান করে না। সেজন্য অসুরদের ‘প্রেত’ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

কালকঙ্কক অসুররা আর এক শ্রেণীর প্রেতের অন্তর্গত এবং তারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর প্রেত। তাদের শরীরে রক্তমাংস অতিশয় কম এবং তাদের আকৃতি শুষ্ক পত্রের ন্যায়। তাদের শরীরের আকৃতি ত্রিগব্যুতি প্রমাণ। তাদের চক্ষুদ্বয় বের হয়ে কর্কটের ন্যায় মাথার উপর স্থাপিত থাকে। মুখখানি সরু এবং সূচীছিদ্রবৎ, তাও আবার মাথার উপরে। তাই আহার গ্রহণ করার সময় তাদের মাথা অবনমিত হয়। এরা অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রেত বলে দীঘনিকায়ের পাটিকসুস্তের (সুস্ত সংখ্যা ২৪) বর্ণনায় পাওয়া যায়।

তাদের স্বকৃত পাপকর্মের কারণে এই অসুরগণ পরস্পরকে তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা প্রহার করতঃ ‘শত্রু প্রেত’ ভেবে আক্রোশ করে এবং এইভাবে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করে।

আরও এক শ্রেণীর সত্ত্ব আছে যাদেরকেও অসুর বলা হয়। কিন্তু তারা প্রেত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা দেবতাদের মধ্যে গণ্য।

নিরয় (= নরক) : বৌদ্ধশাস্ত্রে ৮টি মহানরকের কথা জানা যায়, যেমন— সঞ্জীব, কালসূত্র, সংঘাত, রোরুব, মহারোরুব, তাপ, মহাতাপ এবং অরীচি।

১। সঞ্জীব নরক : এই মহানরকে উৎপন্ন হলে পাপীদের মনে হয় তাদের দেহ যেন পুনঃপুনঃ খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হচ্ছে, অথচ তারা জীবিত থাকে। তাদের মৃত্যু হয় না। কারণ তাদের পাপকর্মের প্রভাব এত তীব্র যে, তাদের এভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, কোন মৃত্যু তাদের এই দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেলেও আবার তারা জীবিত হয়ে যায়। তাই এই নরকের নাম হয়েছে ‘সঞ্জীব’।

২। কালসূত্র নরক : সঞ্জীব নরক থেকে ১৫ হাজার যোজন নিম্নে কালসূত্র (কাল সুতো) নরক। ছুতোর মিস্ত্রীরা যেমন কাল সুতোর দাগ দিয়ে কাষ্ঠফলক চিহ্নে থাকে, তেমন যমদূতেরা পাপীদের চিহ্ন করে শুইয়ে চিহ্নে থাকে। সেইজন্য এই নরকের নাম ‘কালসূত্র’।

৩। **সঙঘাত নরক** : কালসূত্র নরক থেকে ১৫ হাজার যোজন নিম্নে সঙঘাত নরক। এই নরকের অধিবাসীরা মনে করে যে, চতুর্দিক থেকে উত্তপ্ত লৌহময় পর্বত দ্বারা তারা পেষিত হচ্ছে। চতুর্দিক থেকে পানীরা অনবরত সংঘর্ষিত হয় বলে এই নরকের নাম ‘সঙঘাত’।

৪। **রোরুব নরক** : সঙঘাত নরক থেকে ১৫ হাজার যোজন নিম্নে রোরুব নরক। এই নরকের অধিবাসীরা মনে করে যে, ধূম ও অগ্নি নবদ্বার দিয়ে ( ২ চক্ষু ২ কর্ণ ২ নাসিকা ১ মুখ ১ মলদ্বার ১ প্রস্রাবদ্বার) তাদের শরীরে অনবরত প্রবেশ করে তাদের সর্বশরীর দগ্ধ করছে। ইহার ধূম এত তীব্র যে পানীরা ধূমের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। ধূম ও অগ্নিশিখার জ্বালায় তাদের অবিরাম রোদন করতে হয় বলে এই নরকের নাম ‘রোরুব’।

৫। **মহারোরুব নরক** : রোরুব নরক থেকে ১৫ হাজার যোজন নিম্নে মহারোরুব নরক। রোরুব থেকে এই নরক বেশী যন্ত্রণাদায়ক, এখানে ধূম নেই। কেবল অগ্নিসত্তাপে পুড়ে পানীরা পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। উঠে বসতে পারে না। অগ্নিশিখায় সমস্ত নরক পরিব্যাপ্ত থাকে। অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে পানীদের অবিরাম রোদন করতে হয় বলে এই নরকের নাম ‘মহারোরুব’।

৬। **তাপন নরক** : মহারোরুব নরক থেকে এই নরক ১৫ হাজার যোজন নিম্নে অবস্থিত। এই নরকের উত্তাপ এত বেশী যে, এখানকার পানীরা এপাশ-ওপাশ ফিরতে পারে না। অগ্নিসত্তাপে স্থিরভাবে দগ্ধ হতে থাকে। পানীদের বন্ধ তালবৃক্ষ প্রমাণ লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করে ও পদদ্বয় লৌহ ফলকে লাগিয়ে যমদূতেরা তাদের সজোরে প্রহার করতে থাকে।

৭। **মহাতাপন নরক (পতাপ)** : তাপন নরক থেকে এই নরক ১৫ হাজার যোজন নিম্নে অবস্থিত। তাপন নরকের উত্তাপ থেকে এই নরকের উত্তাপ অতিশয় প্রখর বলে মহাতাপন নাম হয়েছে। এই নরকে জ্বলন্ত লৌহময় পর্বত থেকে পানীরা অধঃশিরে নিম্নদিকে পতিত হতে থাকে। পর্বতের পাদদেশে উত্তপ্ত সূতীক্লব বক্রমুখ লৌহশলাকা পৌঁতা আছে। পানীরা সেখানে পতিত হয়ে বিদ্ধ হতে থাকে। তারপর লৌহকণ্টকপূর্ণ একটা জঙ্গলময় স্থানে পানীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রবিষ্ট পানীরা এমনভাবে কণ্টকাবদ্ধ হয় যে কারও নাড়িভুঁড়ি, কারও চক্ষু বের হয়ে যায়।

৮। **অবীচি নরক ( ন বীচি = ফাঁকরহিত )** : মহাতাপন নরক থেকে এই নরক ১৫ হাজার যোজন নিম্নে অবস্থিত। ইহাই শেষ নরক। অবিরামভাবে পানীদের দুঃখভোগ করতে হয় বলে এই নরকের নাম ‘অবীচি’। এই নরক সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। পানীরা অগ্নিতাপ সহ্য করতে না পেরে যখন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে, তখন শতশত শলা চারদিক ও উর্ধ্ব-অধোদিক থেকে সজোরে এসে



তাদের শরীর বিদ্ধ করে। এতে পাপীরা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্যান্য নরকের মধ্যে যত প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা আছে, সমস্তই এই নরকে ভোগ করতে হয়।

প্রত্যেকটি মহানিরয়ের চারদিকে চারটি দরজা। চার দরজায় চারজন যমরাজ। অতএব ৮টি মহানিরয়ে যমরাজের সংখ্যা ৩২(অর্থাৎ  $৪ \times ৮$ )। প্রত্যেকটি মহানিরয়ের চারকোণে চারটি প্রবেশদ্বার। এক একটি মহানিরয়ের এক এক পাশে ৪টি ৪টি করে ১৬টি ‘উস্‌সদ নিরয়’। এইভাবে ৮টি মহানিরয়ের চারপাশে ১২৮টি ( $৪ + ৪ = ৮ \times ১৬$ ) ‘উস্‌সদ নিরয়’ আছে।

উপরিউক্ত ৩২ জন যমরাজের প্রত্যেকে এক একটি নিরয়দ্বারের আধিপত্য পেলেও তারা কিন্তু কেউ ঐ সকল মহানিরয়ের অধিবাসী নয়। তাদের বলা হয় ‘বেমনিক প্রেত’, এক প্রকার পরী যাদের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভোগ করতে হয়। অন্যান্য পাপীদের মতো তারা কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করে, কখনও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। কেহ বা দিনের বেলায় কষ্ট পেলেও রাত্রিবেলায় সুখ ভোগ করে।

স্বভাবত যমরাজ খুব ধার্মিক, দয়ালু এবং নরকযন্ত্রণাকাতর পাপীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও কোমলহৃদয়সম্পন্ন। একজন সন্তু উস্‌সদ নিরয়ে জন্ম নেওয়া মাত্রই নিরয়বাসীরা তাকে ঘিরে ধরে এবং তারা তাকে যমরাজের নিকট নিয়ে যায়। তাকে দেখে যমরাজ তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। উপদেশ দেয়, উৎসাহিত করে এবং তার পূর্বজন্মের কোন সুকর্মের কথা জানা থাকলে ব্যক্ত করতে বলে। যদি নবজাত সেই সন্তু কোন সুকর্মের কথা স্মরণ করতে পারে সে তা ব্যক্ত করে। যমরাজ তখন সেই সুকর্মের অসাধারণ গুণের ও শক্তির কথা বলে তাকেই আশাষিত করে, ফলে নবাগত সন্তু ইচ্ছা করে যাতে সে দিব্যসুখ উপভোগ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ দিব্যদেহে রূপান্তরিত হয় এবং সেই নিরয় থেকে নিজেই মুক্ত করে। অন্যদিকে সেই নবাগত সন্তু যদি তার অতীত জন্মের কোন সুকৃতির কথা স্মরণ করতে না পারে তখন যমরাজ তাকে বলে : “আমি দুঃখিত যে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। যে কর্ম (অর্থাৎ পাপকর্ম) তোমাকে এই নিরয়ে নিয়ে এসেছে, সেই কর্ম তোমার মাতাপিতা বা কোন আত্মীয় করেনি, তুমি নিজেই করেছে। অপরাধ তোমারই, অতএব তোমার পাপকর্মের ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।” একথা বলে যমরাজ তার কাছ থেকে চলে যায়। যমরাজ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল নিরয়ের নিরয়পালেরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে ধরে নানাভাবে তার উপর অত্যাচার শুরু করে—তাকে প্রহার করে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে এবং তাকে বিশেষ একটি নিরয়ে নিয়ে যায়। অথবা নরকপালেরা তাকে সরাসরি একটি মহানিরয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করে, যেখানে নরকগ্নিতে সে দগ্ধীভূত হতে থাকে যতদিন না তার কৃত

পাপকর্মের ফল নিঃশেষিত না হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহানিরয়ে উৎপীড়ক কোন নরকপাল থাকে না যারা অন্যদের শাস্তি দিতে পারে।

উপরের বর্ণনা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, যে সকল সন্তু অতীতে বেশি পুণ্য করেছে এবং অল্প পাপ করেছে তারাই এই সকল উস্‌সদ-নিরয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অতীতের সুকৃতি থাকলে যমরাজের কৃপায় দিব্যদেহ ধারণ করে দিব্যসুখ উপভোগ করতে পারে। কিন্তু যে সকল সন্তু অতীতে বেশি পাপ কাজ করেছে, পুণ্য কম করেছে অথবা একেবারে করেনি, তারা সরাসরি এই সকল মহানিরয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কোন কোন থের (monk) এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, নিরয়ে কোন নিরয়পাল বা উৎপীড়ক থাকে না যারা নিরয়ে জন্মগ্রহণকারী সন্তুদের চারদিকে ঘিরে ধরে শাস্তি দেয়। কিন্তু পুতুল নাচের যন্ত্রের মতো নিজেদের পাপকর্মের প্রভাবে নিরয়ে উৎপন্ন সন্তুগণ মনে করে যে যমদূতেরা তাদের শাস্তি দিচ্ছে (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যমদূত বা শাস্তিদাতা নেই)। অন্যান্য থেরগণ আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে যমদূত আছে যারা নিরয়ে উৎপন্ন সন্তুদের উৎপীড়িত করে শাস্তি দেয়।

(মনোরথপুরাণী, Vol. I, পৃ: ৩৭৪)

নিমিজাতকে (জাতক সংখ্যা ৫৪১) কৌতূহলোদ্দীপক বহু নিরয়ের বর্ণনা আছে। বিদেহরাজ্যে রাজা নিমি ছিলেন ধার্মিক। পণ্ডিত এবং দয়ালু। তিনি প্রার্থীদের নিকট মহাদান দিতেন। দেবরাজ শত্রু একবার রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ রাজার মনে একটা শঙ্কা ছিল : ‘কোনটা বেশী ফলপ্রদ— ব্রহ্মার্চ্য রক্ষা অথবা মহাদান দেওয়া?’ কে তাঁর এই শঙ্কা দূর করতে পারে? তাই তিনি রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজার সঙ্গে শত্রুর অনেক সংলাপ হওয়ার পর শত্রু রাজাকে বললেন—‘কিন্তু, মহারাজ, যদিও ব্রহ্মার্চ্য দান দেওয়ার চেয়ে শ্রেয়, তথাপি উভয়ই মহান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত। মহারাজ, আপনি উভয় বিষয়েই সজাগ থাকবেন—দানও দেবেন, ধর্মজীবনও যাপন করবেন।’ এই বলে শত্রু তাঁর দেবলোকে চলে গেলেন। দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করলে অন্যান্য দেবতারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন—‘প্রভু, অনেকদিন আপনাকে দেখিনি। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?’ ‘মহাশয়গণ, মিথিলার রাজা নিমির মনে একটা শঙ্কা জেগেছিল, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তাঁকে শংকামুক্ত করতে।’ তারপর দেবরাজ শত্রু গাথায় বললেন—

‘বলছি যা, সমবেত দেবগণ

অবহিতচিন্তে তা করুণ শ্রবণ :

ধার্মিক বলে গণ্য ভূমণ্ডলে যারা

উচ্চ-নীচ বর্ণভেদে বহুবিধ তাঁরা।

অরিন্দম, পরমার্থকারী, সুপণ্ডিত

বিদেহের পতি নেমি সর্বত্র বিদিত।  
 মহাদানশীল তিনি, দানের সময়  
 হ'ল তাঁর মনে সন্দেহ উদয়—  
 দান আর ব্রহ্মার্চ্য—কোনটি প্রধান?  
 কোনটি এদের করে মহাফলদান।'

এভাবে কিছুই অনুস্ত না রেখে শত্রু রাজার গুণ বর্ণনা করলেন। তা শুনে নেমিকে দেখার জন্য দেবতাদের ইচ্ছে হ'ল। তাঁরা বললেন—‘মহারাজ, নেমিই আমাদের আচার্য। তাঁর উপদেশ মত চলে এবং তাঁরই কৃপায় আমরা এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করেছি। তাঁকে দেখার জন্য আমাদের বড়োই ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি তাঁকে আহ্বান করে আমাদের দেখান।’ শত্রু এই প্রস্তাব সুসঙ্গত মনে করে সম্মত হলেন এবং সারথি মাতলিকে ডেকে বললেন—‘সৌম্য মাতলে, তুমি আমার (বৈজয়ন্ত) রথ যোজনা করে মিথিলায় যাও এবং মহারাজ নিমিকে সেই দিব্য যানে তুলে এখানে নিয়ে এস।’ মাতলি ‘যে আজ্ঞা’ বলে রথ যোজনা করে যাত্রা করলেন। মাতলি বায়ুবেগে অগ্রসর হয়ে রথ ঘুরালেন এবং প্রাসাদ-বাতায়নের ঝনকাঠের নিকট থামলেন এবং রথ সুসজ্জিত করে রাজাকে আরোহণের জন্য অনুরোধ করলেন।

রাজা ভাবলেন—‘দেবলোক কখনও দেখিনি, এখন দেখতে পাব’ এবং অন্তঃপুরচারিণী এবং প্রজাদের আহ্বান করে বললেন—‘আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো। তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি পুণ্যকাজে নিরত থাক।’ তারপর রাজা রথে আরোহণ করলেন। মাতলি রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন—

‘কোন পথে, রাজশ্রেষ্ঠ, যাবেন প্রথমে?  
 পাপীর যন্ত্রণাগার, স্বর্গবাস পুণ্যস্থান,  
 কোনটি দেখতে আগে ইচ্ছা হয় মনে?’

—রাজা ভাবলেন—‘আমি ত দেবলোকে নিশ্চয়ই যাব। প্রথমে তবে নরকই দেখা যাক।’ তিনি মাতলিকে বললেন—‘হে মাতলি, দিব্যসারথি, আমি উভয়স্থান দেখতে ইচ্ছুক—পাপীরা যেখানে থাকে এবং পুণ্যস্থান যেখানে থাকেন।’ মাতলি ভাবলেন—‘দু’টি স্থান একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়। তাই রাজাকে বললেন—‘রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি কোন স্থান আগে দেখতে চান পুণ্যস্থানের স্বর্গ না পাপীদের যন্ত্রণাগার?’ রাজা ভাবলেন—‘আমি ত স্বর্গে যাচ্ছিই, মাঝপথে নরক দেখে নিতে পারলে ক্ষতি কি?’ তিনি গাথায় বললেন—

‘দেখব নরক আগে পাপীরা যেখানে থাকে  
 ক্রুরকর্মাদের স্থান করব দর্শন,  
 দেখবো কি গতি লভে দুঃশীল যেজন।’

একথা শুনে মাতলি রাজাকে বৈতরণী দর্শন করালেন। এই বৃন্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করবার জন্য শাস্তা বললেন—

‘দেখাল নরবরে মাতলি তখন  
মহাঘোরা ক্ষারোদকা বৈতরণী নদী,  
ফুটছে জলরাশি অবিরত যার  
ছতাসন শিখাসম প্রচণ্ড উস্তাপে।’  
ঘোরা বৈতরণী গর্ভে পড়ছে পাপী  
দেখি, তা মাতলিকে বললেন নেমি :  
পাপীর যন্ত্রণা ঘোর করি দরশন  
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে!  
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে  
পেতেছে যন্ত্রণা পড়ি বৈতরণী-জলে।’  
কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,  
রাজার ছিল না জ্ঞানা; সে কারণ তিনি (মাতলি)  
লাগলেন বুঝাতে পাপ-পরিণাম:—  
‘সবল হয়ে যদি জীবলোকে কেহ  
দুর্বলারে করে হিংসা, অথবা পীড়ন,  
সে নিষ্ঠুর পাপকর্মা জীবনাবসানে  
শাস্তি পায় পড়ি এই বৈতরণী-জলে।’

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মাতলি রাজার সম্মুখ থেকে বৈতরণী অদৃশ্য করালেন। তারপর মাতলি স্বর্গের দিকে রথ চালিয়ে দিলেন। যেতে যেতে পথিমধ্যে দেখালেন কুকুর, গৃধ্র, কাক এবং অন্যান্য পশুরা কিভাবে পাপীদের দেহ ছিঁড়ে মাংস ভক্ষণ করছে। রাজা এসব দেখে প্রশ্ন করলেন মাতলিকে—‘হে দেবসারথে, বল শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে কাকোলের ভক্ষ্য হয়ে রয়েছে এখানে?’

মাতলি রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

‘ইতর, অভদ্র, কৃপণ যারা ছিল  
অপরের দানে বাধা দিত যারা,  
বলিত দুর্বাক্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণে  
হিংসাপরায়ণ, কোপনস্বভাব  
হেন মহাপাপিগণ  
হয়েছে কাকোল-ভক্ষ্য নরকে এখন।’

রাজার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও মাতলি এইভাবে দিয়েছিলেন—

‘জ্বলছে নিরয়ীর শরীর অনলে  
জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ কুণ্ডের ভিতরে  
পড়ছে কেহ কেহ করছে ছটফট আত্মকর্মদোষে।  
দেখি ইহা বড় ভয় হয় মনে,  
বল হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে  
ভূতলে পতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে?’

দেবসারথি মাতলি বললেন কিভাবে পাপের ফল পক্ হলে পাপীদের এরূপ  
যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় :

‘জীবলোকে যে সকল মহাপাপী  
করে হিংসা-দ্বেষ সাধুশীল নর বা নারীকে  
ভ্রূরকর্মা তারা এবে সে পাপের ফলে  
ভূতলে পতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে।’  
“করবো ‘শ্রেণী’র হিত এই উদ্দেশ্যে  
যারা সংগ্রহি অর্থ, গণজ্যোষ্ঠগণে  
উৎকোচ করে দান, মিথ্যা সাক্ষ্য বলে  
করে উহা আত্মসাৎ, জেনে শুনে, আর  
লুণ্ঠায় সে ধন যারা সেই পাপাঙ্গারা  
জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ডে পড়ে এখন  
করছে ছটফট আত্মকর্মদোষে।”  
‘প্রজ্বলিত, অগ্নিময় পর্বতপ্রমাণ  
দ্রবীভূত লৌহপূর্ণ কটাহ অই হোথা  
ভীষণ জ্বালায় যার ঝলসে নয়ন  
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন  
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথি!  
কি পাপের ফলে পড়ে ভিতরে উহার  
অধঃশিরে পাপিগণ, বল ত আমায়?’

দেবসারথি মাতলি রাজাকে বলতে লাগলেন কোন পাপের পরিণামে পাপীগণ  
এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। মাতলি বললেন—

‘সাধুশীল শ্রমণব্রাহ্মণগণে যারা  
হিংসে, কিংবা পীড়া দেয়, সেই মহাপাপে  
পড়ে তারা অধঃশিরে লৌহপাত্রে এবে।’

(নরকপালেরা পাপীদের)

‘ছিঁড়ি মুণ্ড তপ্তজলপূর্ণ  
কটাহে দিতেছে ফেলিয়া.....।  
দেখে বড় ভয় পাই মনে  
বল, হে মাতলে, কোন পাপে এইরূপে  
পাপীর মস্তক ছিন্ন হয় বারবার?’

[মাতলি বললেন]—

‘জীবলোকে যে পাপীরা পাখী ধরি তার  
পক্ষ দু’টি ফেলে ছিঁড়ি, অথবা মস্তক  
সেই শাকুনিক সব নরকে রাজন্,  
শুয়ে দারুণ দুঃখ পায়

ছিন্নমস্তক হয়ে বারবার।’

‘প্রচুর সলিলে পূর্ণা সমতটা অই  
বইছে নদী, যার আছে দুই ধারে  
সুগঠিত ঘাট সব; পিপাসার্ত লোকে  
যায় হোথা সুশীতল বারিপান তরে,  
কিন্তু কি আশ্চর্য! দেয় মুখে যবে জল,  
অমনি তা শুষ্ক ভূসিতে হয় পরিণত।

দেখে বড় ভয় পাই মনে  
বল, হে মাতলে, কোন পাপে এইরূপে  
সুশীতল জল হয় ভূসিতে পরিণত?’

[উত্তরে মাতলি রাজাকে বললেন]—

‘ভাল শস্যে মিশিয়ে তুষ যে বণিক  
ক্রেতাকে বঞ্চনা করে, সেই মহারাজ,  
নরকজ্বালায় যবে পিপাসার্ত হয়ে  
নদীতে ছুটে যায়, কর্মদোষে তার  
নদীর সলিল হয় তুষে পরিণত!’

‘হানিছে উভয়পার্শ্বে নিরয়িগণের  
যারা চীৎকার করে ক্রন্দনরত  
শরশক্তি তোমরা দি নরকপালেরা।  
দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে।

কোন পাপে, হে মাতলে, এই সব সত্ত্ব  
হচ্ছে ভূপাতিত শক্তিশরাঘাতে?’

[মাতলি বললেন]—

‘যে সকল পাপাশয় থাকি জীবলোকে,  
অপহরি ধন, ধান্য, সুবর্ণ, রজত,  
অজ্ঞ-মেঘ-মহিষাদি, পশু অপরের  
করত, হে ভূমিপাল, জীবিকানির্বাহ  
তারাই সেই পাপে নরকভূতলে  
হচ্ছে পাতিত এবে শক্তিশরাঘাতে।’

‘গ্রীবায আবদ্ধ অই লৌহময় পাশে  
রয়েছে পাতকী সব; অন্য এক দল  
খণ্ডবিখণ্ডিত হয় শস্ত্রের আঘাতে  
দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে  
কি পাপের হেতু বল হে দেবসারথ্যে,  
খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ হচ্ছে এদের?’

[মাতলি বললেন]—

‘গো-মহিষ-ছাগ-মেঘ-শুকর-মীনাদি  
প্রাণিহত্যা যাদের বৃত্তি জীবলোকে,  
বধি মাংস তাদের বিক্রয়ের তরে  
সূনায় সাজিয়ে যারা রাখে স্তুপাকারে  
সেই ক্রুরকর্মা সব জীবনাবসানে  
খণ্ড-বিখণ্ডিত হয় নরকে এখন।’

‘মলমূত্রে পূর্ণ অই হৃদ দেখা যায়,  
ওষ্ঠাগত প্রায় প্রাণ পৃতিগন্ধে যার।  
ক্ষুধার্ত পাপীরা দেখ, ধায় ওর পানে,  
ওখানেই গিয়ে অই মলমূত্র খায়।  
দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে  
কি পাপের ফলে এরা, হে দেবসারথ্যে,  
করছে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি মলমূত্র খেয়ে?’

[মাতলি বললেন]—

‘মিত্রদ্রোহী অপরের পীড়ক যারা  
সতত নিরত যারা পরের হিংসায়,

সেই সব পাপী, ভূপ, জীবনাবসানে  
নরকে পড়ে করে মলমুত্র ভোজন।’

‘রক্তপুষে পূর্ণ অই হৃদ অন্যতর  
ওষ্ঠাগত প্রায় প্রাণ পুতিগন্ধে যার  
তৃষ্ণার্ত মানবগণ করছে পান  
ন্যাকারজনক এই রক্ত আর পুষ,  
দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে  
কি পাপের ফলে এরা, হে দেবসারথে,  
করে পান লোকে হেথা রক্ত আর পুষ?’

[মাতলি বললেন]—

‘সমাজের পরিত্যাজ্য পাপাত্মা যে সব  
মাতা, পিতা, পূজনীয় অন্যান্য ব্যক্তির  
করেছে প্রাণবধ থাকি জীবলোকে  
ক্রুরকর্মফলে তারা পড়ে নরকে  
রক্তপুষ পানে করে পিপাসা দমন।’  
‘হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা পাপীর  
শত শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ চর্ম যে প্রকার  
স্থলেতে নিষ্কিপ্ত, হয়, মীনের মতন  
করে এরা ধড়ফড় কান্দে অবিরত,  
মুখ হতে হয় সদা ফেন উদ্গিরণ।  
দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে,  
কোন পাপে বল মোরে, হে দেবসারথে,  
হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা এদের?’

[মাতলি বললেন]—

‘ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে অর্ঘ্যকারকের  
পদে প্রতিষ্ঠিত যারা উৎকোচগ্রহণে  
দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য দেয় কমিয়ে,  
ধনলোভে কুট তুলা করি ব্যবহার  
ওজনের ব্যতিক্রম ঘটায় যারা,  
অথচ বলে মুখে মধুর বচন  
নিজের ধূর্ততা রাখে করি গোপন—  
মৎস্য ধরিবার তরে লোকে যে প্রকার



বড়িশ আমিষে ঢাকি ফেলে জ্বলাশয়ে  
 হেন কূটকারিগণ পরিত্রাণ কভু  
 লভিতে না পারে; তারা নিজ কর্মফলে  
 পায় নাক পুরস্কার পরলোকে গিয়ে,  
 ক্রুরকর্মফলে সেই পাপীরা এখানে  
 পাচ্ছে যন্ত্রণা বদ্ধ হয়ে বড়িশে।’

‘ক্ষতবিক্ষতাস্ত, অই দেখ, নারীগণ  
 বাহু তুলে করছে সতত ব্রন্দন।  
 ছিন্ন গ্রীবা গবী যথা থাকে আঘাতনে,  
 রয়েছে শোণিত-পূয়ে লিপ্তদেহ এরা।  
 ভূমিতে নিখাত আছে আ-কটি শরীর;  
 পর্বতপ্রমাণ উপরাদ্ব প্রজ্বলিত।

দেখি ইহা বড় ভয় পাই মনে,  
 কোন পাপে বল মোরে, হে দেবসারথে,  
 আ-কটি নিখাত আছে ভূমিতে সতত  
 উর্ধ্বকায় যেন জ্বলন্ত পর্বত?’

[মাতলি বললেন]—

‘সংকুলে লভে জন্ম এরা জীবলোকে  
 করল অশ্রদ্ধ কর্ম; ছিল দুষ্চারিণী;  
 করে রূপের গর্বে পতি পরিত্যাগ  
 ভজিল পুরুষান্তরে কামের তাড়নে  
 জীবলোকে কামসুখ চরিতার্থ করি  
 পাচ্ছে এখন এই যন্ত্রণা ভীষণ।’

‘পদদ্বয় ধরে, দেখ, অধঃশিরে অই  
 পাপীকে নরকপাল ফেলিছে নরকে।  
 বল, হে মাতলে, আমি শুধাই তোমায়,  
 কোন্ পাপে মানুষের এ দুর্দশা হয়?’

[মাতলি বললেন]—

‘প্রিয়া পত্নী সর্বশ্রেষ্ঠ ধন মানুষের,  
 হেন ধন হরণ করে যে নরাধম,  
 পরদারসেবী সেই পাপাত্মার হয়।  
 উর্ধ্বপাদে অধঃশিরে নরকে গমন।’

‘বহুবর্ষ এইরূপে নরকবাস করে  
 এতাদৃশ পাপাঙ্গারা ভুঞ্জে দুঃখ সদা।  
 কুরকর্মা দুর্মতিরা কভু, মহারাজ,  
 নাহি পায় পরিত্রাণ জীবনাবসানে।  
 আত্মকৃত কর্ম এসে অগ্রে এদের  
 ব্যবস্থা করে রাখে উচিত দণ্ডের।  
 তাই, এরা অধঃশিরে পড়ছে নরকে।’

এই বলে দেবসারথি মাতলি ঐ নরকও অন্তর্ধাপিত করলেন এবং আরও  
 অগ্রসর হয়ে যে নরকে মিথ্যাদৃষ্টিক লোকে দণ্ডভোগ করে রাজাকে তা দেখালেন।  
 অনন্তর রাজা প্রশ্ন করলে মাতলি তাঁকে সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন।

[রাজা প্রশ্ন করলেন]—

‘লঘুগুরু নানারূপ কুকার্যের আমি  
 দেখিনু নরকে এসে ঘোর পরিণাম।  
 দেখে সব বড় ভয় পাই মনে।  
 বল ত, মাতলে, ঐ লোকগুলো কেন  
 পাচ্ছে হেন তীব্র ভীষণ যাতনা?’

[মাতলি বললেন]—

‘মিথ্যাদৃষ্টি ছিল যাদের জীবলোকে,  
 মোহবশে ভ্রান্তমার্গে চলত নিজেরা  
 অন্যকেও সেই পথে নিত টেনে,  
 সে সব পাষণ্ড এসে নরকে এখন  
 পাচ্ছে হেন তীব্র ভীষণ যাতনা।’

এদিকে দেবলোকে দেবতারা সুধর্মা সভায় সমবেত হয়ে রাজা নিমির আগমন  
 প্রতীক্ষা করছিলেন। মাতলি ফিরতে বিলম্ব করছেন কেন, একথা ভেবে শত্রু  
 বিলম্বের কারণ বুঝলেন। তিনি জানলেন যে, “মাতলি নিজের দৌত্যকুশলতা  
 প্রদর্শন করার জন্য রাজা নেমিকে নিয়ে নরকে নরকে ঘুরছেন এবং পাপীরা অমুক  
 পাপে অমুক নরকে অমুক দণ্ডভোগ করে—এসব রাজাকে বোঝাচ্ছেন। এরূপ  
 করলে রাজা নেমির সমস্ত জীবন কেটে যাবে অথচ তিনি নরকের শেষ দেখাতে  
 পারবেন না।” তখন শত্রু একজন মহাবেগবান দেবপুত্রকে বললেন—‘তুমি  
 মাতলিকে বল গিয়ে যে, রাজাকে নিয়ে শীঘ্র এখানে আগমন করুন।’ দেবপুত্র  
 সত্বর মাতলির কাছে গিয়ে শত্রুর আদেশ জানালেন। তা শুনে মাতলি দেখলেন

যে, আর বিলম্ব করা চলে না। তখন তিনি রাজাকে চতুর্দিকের বহু নরক যুগপৎ দেখিয়ে বললেন—

‘দেখলেন পাপীদের যন্ত্রণা-আগার,  
ক্রুরকর্মাদের স্থান, দুঃশীলের গতি  
স্বচক্ষে, রাজর্ষে, সব পেলেন দেখতে।  
চলুন এখন যাই শত্রুর নিকটে।’

বস্তুতঃপক্ষে চারি অপায়ে উৎপন্ন সন্তুগণের কোন নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নেই; এবং অধঃপাতিত অসুরদের ক্ষেত্রেও তাই।

এখন, সুগতি স্বর্গলোক সম্বন্ধে বর্ণনার আগে উৎসাহী পাঠকদের হিতার্থে কারণ জ্ঞানাতে চাই কেন সারা বিশ্বে অকল্পনীয়ভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে, ফলে অচিন্ত্যনীয় দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যাভাব হচ্ছে। অবিশ্বাস্য অসামাজিক ও পাশবিক বর্বরতা অধিকাংশ মানুষদের মধ্যে বেড়েই চলেছে যারা আমাদেরই পরিবারে, আমাদেরই আত্মীয়স্বজনদের এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারে জন্ম নিয়েছে—সেই জন্ম আমেরিকাতেই হোক, গ্রেট ব্রিটেনেই হোক, ইউরোপে হোক, অস্ট্রেলিয়ায় হোক, ভারতে হোক, শ্রীলংকায় হোক—পৃথিবীর যে কোন স্থানে হোক।

বাস্তবিক, বর্ষীয়ানদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তাঁরা বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষের উদাসীন, নিষ্ঠুর এবং অমানবিক ব্যবহার দেখে আতঙ্কগ্রস্ত এবং বিস্ময়ে হতবাক। কেন এরা পশুর মতো, শয়তানের মতো ব্যবহার করে—এটা তাঁদের জিজ্ঞাস্য। তাঁরা বলতে থাকেন ‘বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ক্রটি কোথায়?’ এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? যাঁরা বৌদ্ধ পটভূমিকায় বিচার করবেন তাঁদের কাছে বর্তমান এই অভূতপূর্ব অবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলো বেশী দূরে খুঁজতে হবে না।

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তার নাম ‘কলিযুগ’। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, বর্তমানে মনুষ্যরূপে যারা আমাদের কাছে জন্ম নেয়, তারা যেন-তেন-প্রকারেণ আধুনিক বস্তুবাদের সমস্ত প্রকারের সুযোগ-সুবিধা পেতে চায়। তার প্রত্যাশা করে। ধর্মকর্ম বা অধ্যাত্মবাদ তাদের জন্য নয়। আপনারা আরও লক্ষ্য করবেন যে, এজাতীয় বস্তুতাত্ত্বিক মানুষেরা স্বল্পজীবী হয় এবং তারা বদমেজাজী হয়। তারা অকস্মাৎ অভাবনীয় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, নদী বা সমুদ্রে ডুবে যায়, ট্রেন বা গাড়ী চাপা পড়ে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়, আত্মহত্যা করে, বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যায়-ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আমাদের সমস্যাকে আমাদের বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। এই কলিযুগে যারা মনুষ্যরূপে জন্ম নিয়েছে তাদের অনেকেই (সকলে নয়) বহু কাল ধরে স্বকৃত পাপকর্মবশে চারি অপায় লোকে জন্ম নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই সকল দুঃখময়

যোনিতে থেকেছে। আর আমরা জানি যে নরকও চিরস্থায়ী নয়। তাই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সন্তুগণ এই সব অপায়লোকে অবস্থান করে এই কলিযুগে মনুষ্যরূপে অনেকে জন্ম নিয়েছে। যেহেতু অপায়লোকে তাদের অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, দুঃখ পেতে হয়েছে, সেই অতীতের ছায়া তাদের বর্তমান জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে, তাই তাদের মধ্যে বর্বরোচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, অসামাজিক আচরণ, হিংসা-বিদ্বেষ, অফুরন্ত কামনা-বাসনা দেখা যায়। হ্যাত অতীতের কোন সুকর্মের ফলে বর্তমানে তারা মনুষ্যরূপে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐসব অমানবোচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার সাধারণতঃ বর্তমান প্রজন্মের যুবাসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়—সেই যুবাসম্প্রদায় পৃথিবীর যে কোন স্থানেই জন্ম নিক না কেন। আমাদের মধ্যে অনেককে দেখতে পাই পশুর মতো, অসুরের মতো আচরণ করতে—তাদের অনন্ত লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মোহ, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই দেখা যায় আজকালকার ছেলেমেয়েরা গুরুজনদের প্রতি, মাতাপিতার প্রতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি সম্মান দেখাতে চায় না। তাদের ব্যবহারও গো পশুর মতো। বিশেষ করে ঘণ্ডের মতো—চলমান গাড়ীর নীচে চাপা পড়বে তাও রাস্তার পাশে সরে দাঁড়াবে না। আবার ঘণ্ড যেমন নিজের খাদ্য (খড়ের বাগুল) যা তাদের পাশে বাঁধা থাকে, সে বিষয়ে সচেতন, এরাও জানে কি করে নিজেদের জিনিসপত্র এবং ধনদৌলত সামলিয়ে রাখতে হয়, অন্যদের জিনিসপত্র বা ধনদৌলত নয়। কেউ কেউ বিষধর সাপের মত চট করে রেগে যায় এবং বদলা নেয়। কেউ কেউ বিড়ালের মতো আড়ি পেতে থাকে, এবং শিকার দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কেউ কুকুরের মতো শিকারের পেছনে ধাওয়া করে। কেউ কেউ শয়তান মটরগাড়ীর ড্রাইভারের মতো (বিশেষ করে অমনিবাস ড্রাইভারদের মতো) যারা পেছনে একটা গাড়ী দেখলে নিজের গাড়ীর গতি কমিয়ে দেয় যাতে পেছনের গাড়ী তাকে ওভারটেক করে। তারপর যেই পেছনের গাড়ী তার গাড়ীকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল, অমনি সে তার গাড়ীর গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে ঐ গাড়ীর পেছনে ধাওয়া করে এবং তাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে যাতে ঐ গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন একটি শান্ত কুকুরও অন্য একটি কুকুরকে দেখলে তাকে ধাওয়া করে। বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে এই সমস্ত চারিত্রিক দোষ দেখা যায়।

কিন্তু আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা যা করছে সেটা তাদের অতীত জন্ম থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা সুপ্ত সহজাত প্রবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন মাত্র। তাই অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে তারা শুধু নিজেদের কথাই ভাবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও অন্যদের কথা ভাবে না। বহুকাল যাবত অপায়লোকে অবস্থান করার কারণে তারা বর্তমানে মনুষ্যালোকে

জন্মগ্রহণ করলেও স্বাভাবিক কারণে তাদের চরিত্রে অতীতের অপায়লোকের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতিফলন হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আমরা কি অবাক হয়ে যাচ্ছি?

যাই হোক, একবার মনুষ্যালোকে জন্ম নিলে (অবশ্য যদি তারা দীর্ঘায়ু হয় এবং ভাল মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে) তারা ভাল মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে ৪০-৪৫ বয়ঃকালের মধ্যে উত্তম গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের চলে যাবার দিন অর্থাৎ মৃত্যুকাল এসে যায়—হয় জলে ডুবে মৃত্যু হয়, না হয় আত্মহত্যা ইত্যাদি নানাভাবে অকালমৃত্যু হতে পারে। কারণ এই কলিযুগে মনুষ্যরূপে তাদের আয়ুর পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হয়।

বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। গড়পড়তা মানুষের আয়ু হবে ১০ বৎসর এবং ৫ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হবে। তখন তো পিতা-মাতার প্রতি এবং ভগ্নীদের প্রতি কোন সম্মানই দেখাবে না। মানুষ পশুবৎ আচরণ করবে! গর্ভধারিণী মা এবং সহোদরা বোনেদের সঙ্গে মানুষ যৌনসংসর্গ করবে—অর্থাৎ মানুষ এত নীচমনা হয়ে যাবে। তারপর কলহ ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনোখুনি হবে নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার। মনুষ্য পুরুষ এবং নারী পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।”

(চক্ৰবর্তি-সীহনাদ সুত্ত : দীঘনিকায়, সুত্ত সংখ্যা ২৬)

‘ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসবে যখন এই সকল মনুষ্যগণের সন্তান-সন্ততি দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হবে। দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যের কুমারীগণ পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, গুড় এবং লবণ—এই সকল রসের স্বাদ লুপ্ত হবে। কোরদূষক (= এক প্রকার ধান্য) তাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হবে। এখন মাংস-মিশ্রিত শালি-অন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন। সেইরূপ কোরদূষক ঐ সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল কর্মপথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হবে। দশ অকুশল কর্মপথ অতিশয় প্রবল হবে। তাদের মধ্যে ‘কুশল’ নামক কোন শব্দ থাকবে না। কুশলের কারক কি প্রকারে থাকবে? তাদের মধ্যে যারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হবে, তারাই পূজা ও প্রশংসার্পী হবে। যেকোন, এখন যারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান্ এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তারাই পূজা ও প্রশংসার্পী হয়। সেইরূপই ওদের মধ্যে যারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তারাই পূজা ও প্রশংসার্পী হবে।’

‘হে ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, আচার্য-

ভাৰ্য্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থাকবে না। ছাগ-মেঘ, কুকুট-শূকর, শৃগাল-কুকুরের ন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে।’

‘ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিন্তা পোষণ করবে—মাতারও পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি, উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হবে। মৃগ দেখে মৃগয়াসক্তের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ভাবাপন্ন হবে।’

অবশ্য এখনও সেই দিন বহু দূরে আছে যখন মানুষ কোরদুষক খেয়ে জীবনধারণ করবে। আমরা সেই দিন থেকে বহু দূরে আছি এটাই সত্যনা।

বিশ্বের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে—সব রকম পরিবার-পরিকল্পনা ব্যর্থ। কিন্তু বিশ্বে পরিবার-পরিকল্পনা চালু হওয়া সত্ত্বেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি? কারণ—একটাই। চারি অপায়লোকের সন্তুগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে (আমরা পূর্বে বলেছি যে, অপায়লোকে বাসও চিরস্থায়ী নয়) আবার এই মনুষ্যালোকেই জন্ম নেয়। অধিকাংশের আচার-ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় যে তারা অপায়লোক থেকেই মনুষ্যালোকে জন্ম নিয়েছে তাই পূর্বনিবাসের জীবনযাত্রা ও ব্যবহারের কথা ভুলে যায়নি। সেগুলোই তাদের বর্তমান জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে—আকৃতি মনুষ্যের হলেই বা কি!

কিন্তু, এখনও সব হারিয়ে যায়নি। আমাদের কাছে এখনও ভাল ভাল সন্তান জন্ম নেয় যদিও সংখ্যায় কম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কাদের কাছে জন্ম নেয়। সেই সমস্ত সন্তান ভাল মায়েদের নিকটই জন্ম নেয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে চারপ্রকার গুণ মায়েদের থাকলে তারা স্বর্গলোক থেকে ঐ সকল সন্তানদের আকৃষ্ট করতে পারে :

১। মা হবেন মেধাবিনী। এটাই স্বাভাবিক, কারণ ভাল সন্তান কখনও মূর্খ ও নির্বোধ মায়েদের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে না।

২। মা শীলবতী হবেন।

৩। মা তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকদের এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।

৪। মা হবেন পতিব্রতা। একজন মাত্র স্বামীর প্রতিই অনুগতা এবং দ্বিচারিণী হবেন না।

ঈদৃশ চার প্রকার গুণসম্পন্না নারীর নিকটই সৎ, চতুর এবং চরিত্রবান সন্তান স্বর্গ থেকে এসে জন্ম নেয়। এই সকল সৎ সন্তান-সন্ততি যে সকল মাতাপিতার নিকট জন্ম নেয় তারা সত্যই ভাগ্যবান এবং যে দেশে তারা জন্ম নেয় সে দেশ তাদের গর্বে গর্বিত।

## সুগতি (স্বর্গলোক)

আমরা চারি অপায় এবং ১২৮ প্রকার নরকের বিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কামলোকে যে সকল সুগতি স্বর্গলোক আছে সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

২ প্রকার সুগতিলোক আছে। মনুষ্য ও স্বর্গ।

স্বর্গ ষড়বিধ + ১ মনুষ্যালোক = ৭ সুগতিলোক।

মনুষ্যালোক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ মনুষ্যেরা নিজ নিজ সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে বিভিন্ন কুল-বংশে জন্ম নেয়—ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সুন্দর-কুৎসিত, প্রভাবশালী-প্রভাবহীন, বুদ্ধিমান-নির্বোধ ইত্যাদি।

বোধিসত্ত্বগণ (অর্থাৎ বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করার জন্য প্রাণিধানযুক্ত সত্ত্ব) মনুষ্যালোকেই জন্মগ্রহণ করেন—যেখানে ভাল এবং মন্দ উভয়প্রকারের কর্ম বর্তমান থাকে—কারণ মনুষ্যালোকেই সর্বোত্তম কারণ এখানে পারমিতা (দশ পারমিতা) পূর্ণ করার অবকাশ আছে। চরমভবিক বুদ্ধ মনুষ্যালোকেই জন্মগ্রহণ করেন। মনুষ্যই বুদ্ধ হতে পারেন, কোন দেব বা ব্রহ্মা পারেন না।

দেবলোকে ৩ প্রকার ‘দেব’ আছেন :

১। সম্মুতিদেব, ২। উপপত্তিদেব এবং ৩। বিসুদ্ধিদেব। নৃপতিগণ যারা আমাদের শাসন করেন তাঁদের বলা হয় ‘সম্মুতিদেব’। কারণ জনসাধারণ তাঁকে ‘দেব’ বলেই সম্বোধন করেন।

যারা সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের বলা হয় ‘উপপত্তিদেব’।

অর্হৎদের বলা হয় ‘বিসুদ্ধিদেব’, কারণ তাঁরা সমস্ত প্রকার মানসিক ক্রেশ (impurities, depravities) থেকে মুক্ত হয়েছেন।

## ছয় দেবলোক

১। চাতুম্মহারাজিক — চারজন মহারাজের স্বর্গ। পৃথিবীর চতুর্দিকের অধীশ্বর চারজন মহারাজের নামে এই স্বর্গের নাম হয়েছে ‘চাতুম্মহারাজিক’।

২। তাবতিংস — দেবরাজ শক্র প্রমুখ ৩৩জন জনহিতকামী দেবগণের এই দেবলোক। ত্রি-ত্রিংশ (= ৩৩) শব্দ থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ বা তাবতিংস স্বর্গের নামকরণ হয়েছে।

৩। যাম — যাম দেবগণের এই দেবলোক। সুয়াম দেবপুত্র এই দেবলোকের অধীশ্বর।

৪। তুসিত — আনন্দ বা সন্তুষ্টির দেবলোক। বোধিসত্ত্ব, তাঁর পরিবারবর্গ এবং মহাপ্রাবকগণ ১০ পারমিতা পূর্ণ করে বুদ্ধযুগের অপেক্ষায় এই স্বর্গে অবস্থান

করেন। কথিত আছে যে ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এই স্বর্গে অবস্থান করছেন।

৫। নিম্মানরতি—এখানে ঐ সকল দেবতারা বাস করেন যারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে আনন্দ অনুভব করেন।

৬। পরনিম্মিতবসবস্তী—এই দেবলোকের দেবতারা অন্যদের সৃষ্টি নিয়ে চরিতার্থ হন। বৌদ্ধদের নিকট পরিচিত মার-দেবপুত্র এই দেবলোকে বাস করেন। বসবস্তি-দেব নামক এক ধার্মিক রাজা এই দেবলোকের অধিপতি। মার-দেবপুত্র তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে এই দেবলোকের এক কোনায় বাস করেন। তিনি যেন একজন বিদ্রোহী রাজকুমার রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রদেশে অবস্থান করেন। মার দেবপুত্র তাঁর কিছু সংকর্মের প্রভাবে এই দেবলোকে জন্ম নিয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করছেন। কিন্তু তাঁর পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলে তাঁর পাপকর্মের জন্য তিনি আবার অপায়লোকে জন্ম নেবেন।

এই সকল দেবলোকে দেবগণের উৎপত্তি ‘ওপপাতিক’ অর্থাৎ তাঁরা আপনা থেকে স্বেচ্ছায় জন্ম নেন। তাঁরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় জন্মগ্রহণ করেন। যদি কোন দেবতার কোলে আবির্ভূত হন তখন তাঁদের সেই দেবতারই পুত্র-কন্যারূপে ধরে নেওয়া হয়। যদি নারীরূপে কোন দেবতার শয্যায় আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে সেই দেবতারই ভার্যারূপে গ্রহণ করা হয়। যারা শয্যার চতুর্দিকে আবির্ভূত হন তাঁদেরকে পরিচারিকারূপে গ্রহণ করা হয়। আর যদি কোন দেবতার প্রাসাদের সীমানার মধ্যে অন্য কোন স্থানে আবির্ভূত হন তাঁদেরকে ঐ দেবতার ভৃত্যরূপে গ্রহণ করা হয়। আবার যদি দুইজন দেবতার প্রাসাদের সীমানার মাঝখানে কোন ওপপাতিক সত্ত্ব জন্ম নেয়, তখন তাকে নিয়ে দুই দেবতার মধ্যে সংঘাত হয়। এজাতীয় বিবাদ উৎপন্ন হলে তার মীমাংসার জন্য ঐ দেবলোকের যিনি অধিপতি তাঁর উপর ভার দেওয়া হয়। তাবতিংস স্বর্গে এ জাতীয় বিবাদ উৎপন্ন হলে তার মীমাংসার ভার দেবরাজ শক্রের উপর ন্যস্ত হয়। যদি নবাগত দেবতা কোন দেবতার প্রাসাদের খুব কাছাকাছি জন্ম নেয়, তাহলে তার দাবীদার হবেন সেই প্রাসাদের অধিপতি দেবতা। আবার যদি এমন জায়গায় জন্ম নেয় যা দুই দেব-প্রাসাদের কোনটার বিশেষ কাছাকাছি নয়, তখন সেই নবাগত দেবতা দেবরাজ শক্রের অধিকারে থাকবেন। [পালি দীঘনিকায়ের সঙ্কপএঃ সুত্তের অট্টকথাতে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে]।

দেবতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে বর্ণনা আছে দীঘনিকায়ের মহাপদান সুত্তের অট্টকথাতে এবং মল্লিমনিকায়ের অচ্ছরিয়ধম্ম সুত্তের অট্টকথাতে। বলা হয়েছে যে, দেবতাদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে যে জ্যোতি বের হয় তা দ্বাদশ



যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁদের দেহ এবং প্রাসাদ থেকেও তদ্রূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।

জাতক নিদান কথায় বলা হয়েছে যে এই সকল দেবতারা যে বস্ত্র পরিধান করেন তার মধ্যে বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম বস্ত্রটিকে যখন ভাঁজ করে গুটিয়ে নেওয়া হয় তখন তা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ‘সমতা’ পুষ্পের মত হয়, এবং সূক্ষ্মতম বস্ত্রটি আকারে ‘তুষ’ পুষ্পের মত হয়।

উপরিউক্ত দেবগণ ছাড়াও আরও অনেক দেবতা আছেন যারা পৃথিবীবাসী। যেমন বৃক্ষদেবতা। তাদেরও প্রাসাদ আছে, তবে অদৃশ্য। কারণ তাঁরা মনুষ্যচক্ষুর নাগালের বাইরে থাকেন। চাতুস্মহারাজিক দেবগণের অনুমতি নিয়েই বৃক্ষদেবতারা পৃথিবীতে বাস করেন। যদি কোন বৃক্ষশাখায় তাঁদের বাসস্থান থাকে, তাহলে সেই বৃক্ষশাখা ভেঙে গেলে তাঁদের বাসস্থানও ভেঙে যায় এবং অদৃশ্য হয়। যদি বৃক্ষের মূলকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের বাসভবন যুক্ত থাকে তাহলে যতদিন বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে থাকবে, তাঁদের বাসস্থানও বর্তমান থাকবে। মল্লিমনিকায় চুলধন্যসমাদান সুন্দের অট্টকথাতে এই বিষয়ে বর্ণনা আছে।

একথা বৌদ্ধদের মধ্যেও বিশেষ অবগতি নেই যে, দেবগণের মধ্যে প্রতিমাসের ২ পক্ষে ২ বার দেবসভা হয় যেখানে দেবতারা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে বৃক্ষদেবতারাও সম্মিলিত হন এবং তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় তাঁরা বৃক্ষরাজীর পরম্পরাগত নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেন কিনা। অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে যারা বৃক্ষছেদন করতে থাকে তাদের প্রতি তাদের ব্যবহার কিরকম হয়, তারা এতে বিরক্তি বোধ করেন কিনা। যদি কোন বৃক্ষদেবতা এই নিয়ম ভঙ্গ করেন, তিনি দেবসভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। বিনয়পিটকের ভূতগাম-শিক্ষাপদের অট্টকথাতে (= সমস্তপাসাদিকাতে) ইহা বর্ণিত হয়েছে।

মল্লিমনিকায়ের মারতজ্জনয় সুন্দের অট্টকথাতে বলা হয়েছে যে, এমন কোন দেবলোক নেই যেখানে দেবসভা (অর্থাৎ সুধন্মা সভা) নেই।

### দেবলোকে মৃত্যু

দেবলোকে কি করে মৃত্যু হয় তার এক চমকপ্রদ বর্ণনা পালিসাহিত্যে পাওয়া যায় (ধন্মপদ অট্টকথা, ঘোষকের কাহিনী)। দেবগণের মৃত্যু বা পতন হয় চারটি কারণে।

১। বিশেষ একটি দেবলোকে দেবতার আয়ুক্ষয়।

২। কোন একটি দেবলোকে জন্ম নেওয়ার জন্য যে পুণ্যের প্রয়োজন সেই পুণ্যের ক্ষয়।

৩। নির্দিষ্ট সময়ে আহার গ্রহণ না করা।

৪। অত্যধিক ক্রোধ।

যিনি অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছেন, দেবলোকে তাঁর পুনর্জন্মের পরে তিনি ঐ দেবলোকের দেবতাদের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। কিন্তু তাঁর পুণ্যক্ষয় হলে ঐ দেবলোকের আয়ুষ্কাল অবধি তিনি সেখানে থাকতে পারেন না। তাঁর দেবলোক থেকে চ্যুতি বা মৃত্যু হয়। কোন কোন দেবতা দেবলোকের আনন্দ-ফুর্তিতে এত মশগুল হয়ে যান যে, তাঁরা যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়ার কথাই ভুলে যান। ফলতঃ অনাহারে তাঁরা অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং দেবলোক থেকে চ্যুত হন। কেহ কেহ অন্যের সমৃদ্ধি দেখে পরভ্রীকাতরতাবশতঃ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার কারণ হচ্ছে এই যে তাঁরা সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী বিধায় ক্রোধাগ্নি সহ্য করার ক্ষমতা তাঁদের দেহে থাকে না। তাই তাঁদের দেহ ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে ভূপতিত হয়।

দেবলোকে মৃত্যু সন্নিহিত হলে দেবতাদের দেহে পাঁচটি নিমিত্ত দেখা যায় :

(১) তাঁদের গলার মালা ক্রমশঃ শুষ্ক হতে থাকে।

(২) তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র মলিন হতে থাকে।

(৩) তাঁদের বগল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে।

(৪) দেহের রং বিবর্ণ হতে থাকে।

এবং (৫) দিব্য আসনে বসে থাকলেও সুখ বা আনন্দ অনুভব করে না।

এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, দেবলোকে জন্মগ্রহণ করা এবং দেবলোক থেকে চ্যুত হওয়া—এর মাঝখানে তাঁদের দাঁতের কোন ক্ষয় হয় না, বা দাঁত পড়ে যায় না। তাঁদের চুল পাকে না। দেবলোকের দেবীগণ আজীবন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর মতো রূপলাবণ্যসম্পন্না থাকেন অর্থাৎ আমৃত্যু তাঁদের রূপলাবণ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। তদ্রূপ পুরুষ দেবতারা বিংশতি বর্ষীয় যুবকের মতো থাকেন অর্থাৎ আমৃত্যু তাঁদের যৌবনের পরিহানি ঘটে না। অবশ্য মৃত্যুকালে তাঁদের দেহ বিবর্ণ হয়। তাঁরা ক্লান্ত হয়ে মূর্ছাগ্রস্ত হন। মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁরা হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেন।

পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষের মৃত্যুকাল আসন্ন হলে কতগুলি নিমিত্ত দেখা যায়। যেমন—উষ্ণাপাত, ভূমিকম্প, চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ ইত্যাদি। ঐ সময়ে খুব অল্প কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জানতে পারেন। তদ্রূপ দেবগণের মধ্যেও যারা বিজ্ঞ তাঁরাই কেবল নিমিত্তগুলো দেখে বলতে পারেন কি ঘটনা ঘটতে চলেছে। ইতিবৃত্তকের অট্ঠকথাতে এই সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দেবতাদের মৃত্যু হলে তাঁদের বিমানের কি অবস্থা হয়? দেবতাদের মৃত্যু হলে তাঁদের বিমানও ধ্বংস হয়ে যায়, কোন চিহ্নমাত্র থাকে না, যেমন কর্পূর পুড়ে

গেলে কিছুই তার অবশিষ্ট থাকে না। (দীঘনিকায়ের সঙ্কপএহসুস্তের অট্টকথা দ্রষ্টব্য)।

কামলোকে যে ছয়টি দেবলোক আছে (উপরে বর্ণিত হয়েছে) সেই সকল দেবগণের দেহ মনুষ্যদেহ অপেক্ষা মার্জিত ও সংস্কৃত। শুধু তাই নয়, তাঁরা ‘ওপপাতিক’ সম্ভবরূপে ঐ সকল দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মকালে তাঁরা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয় যুবক-যুবতীর ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁদের খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি মনুষ্যদের অপেক্ষা উন্নতমানের হয়ে থাকে। যদিও তাঁরা গুণগত দিকে মানুষের সমকক্ষ হতে পারেন না। স্বর্গলোকে তাঁরাও চিরস্থায়ী নহেন। অন্যান্য জীবের মতো তাঁরাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

রাজা নিমিকে বিভিন্ন নরকের অবস্থা দেখিয়ে দেবসারথি মাতলি রাজাকে বললেন—

‘দেখলেন পাপীদের যন্ত্রণা-আগার,  
 ত্রুরকর্মাদের স্থান, দুঃশীলের গতি  
 স্বচক্ষে, রাজর্ষে, সব পেলেন দেখতে।  
 চলুন এখন যাই শত্রুর নিকটে।’

এই বলে মাতলি দেবলোকাভিমুখে রথ চালালেন। দেবলোকে যাবার কালে রাজা দেখতে পেলেন দেবদুহিতা বীরণীর বিমান—যা সুবর্ণ-মণিময় কুটাগারশোভিত, সর্বালঙ্কারবিভূষিত, উদ্যান-পুষ্করিণীসমন্বিত এবং কল্পবৃক্ষ পরিবৃত। বীরণী তখন একটি কুটাগারে শয্যাপৃষ্ঠে উপবেশন করে মণিময় বাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্বক বাইরে দৃষ্টিপাত করছিলেন। এক সহস্র অপ্সরা তাঁকে বেষ্টন করেছিল। রাজা মাতলিকে এই বিমানের বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেন এবং মাতলি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন :

‘কি সুন্দর, সুগঠিত ঐ যে বিমান,  
 শোভিছে উপরে যার পঞ্চকুটাগার।  
 দিব্যমালাধরা, সর্বাভরণমণ্ডিতা,  
 মহা-অনুভাবা এক নারী ও বিমানে  
 রয়েছে শয়ান, দেবসুলভ বিভূতি  
 চৌদিকে বিকাশ করি নানান প্রকার।  
 দর্শন করে ইহা, হে দেবসারথে,  
 হচ্ছি পুলকিত আনন্দে অপার  
 সম্পাদিয়া কোন সাধুকর্ম নরলোকে  
 এ রমণী স্বর্গসুখ ভুঞ্জন বিমানে?’  
 ‘হয়নি কি জীবলোকে শ্রবণগোচর

বীরণীর নাম কতু? ছিল পুরাকালে  
কোন এক ব্রাহ্মণের গর্ভদাসী সেই।  
যথাকালে সমাগত অতিথি একজন  
করিল তার সেবায়ত্ন, সেবে যথা মাতা  
আত্মগর্ভজাত পুত্রে সানন্দ অন্তরে।  
শীলবতী, ত্যাগবতী সে পুণ্যের বলে  
লাভ এ বিমান এবে ভুঞ্জে স্বর্গসুখ।’

এই কথা বলে মাতলি রথ নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং রাজাকে সোণদিম  
দেবপুত্রের কনকময় সপ্ত বিমান প্রদর্শন করালেন। রাজা বিমানগুলি এবং তাদের  
শ্রীসম্পত্তি দেখে, সোণদিম পূর্বে কি কর্ম করেছিলেন তা জিজ্ঞেস করলেন—

‘ঐ যে জাজ্বল্যমান, মাতলে, সপ্ত বিমান  
শোভিতেছে পুরোভাগে, বিচরণ যেথা  
করেন মহর্ষি, সর্বভূষণে মণ্ডিত  
দেবপুত্র এক, নারীগণ পরিবৃত।

দর্শন করে ইহা, হে দেবসারথে  
হচ্ছি পুলকিত আনন্দ অপার।  
সম্পাদিয়া কোন শুভকর্ম মর্ত্যালোকে  
ভুঞ্জন এ স্বর্গসুখ ইনি সপ্ত বিমানে?’

দেবসারথি মাতলি বললেন—

‘নরলোকে সোণদিম নামে সুবিদিত  
ছিলেন, রাজন, ইনি আঢ্য গৃহপতি,  
মুক্তহস্ত সদা দানে, প্রব্রাজকদের  
উদ্দেশ্যে বিহার সপ্ত নিজব্যয়ে ইনি  
নিরমি উৎসর্গ করলেন পুরাকালে  
সর্বপাপবিনির্মুক্ত সরলস্বভাব  
ভিক্ষু যাঁরা থাকতেন এ সপ্ত বিহারে,  
সেবিতেন সোণদিম সসম্মানে সবে  
সতত প্রসন্ন মনে অন্নবস্ত্র দিয়া  
শয্যা-দীপ আদি আর আবশ্যক যাহা।  
চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,  
প্রাতিহার্যপক্ষে আর পালিতেন ইনি  
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল।

পোষধী হয়ে পালন করতেন শীল।  
 সে সংযম, সেই দানমাহাশ্বে রাজন্,  
 ভূঞ্জন সপ্তবিমানে ইনি স্বর্গসুখ।’

এইরূপে সোণদ্বয়ের পুণ্যের কথা বলে মাতলি সম্মুখের দিকে আরও অগ্রসর হয়ে রাজাকে একটি স্ফটিক বিমান দেখালেন। ইহা পূর্বেরটি অপেক্ষা আরও অধিক মনোরম—নানাপুষ্পফলমণ্ডিত তরুলতার বিচিত্র উদ্যান ও উপবনশোভিত। এই বিমান দেখে রাজা জিঞ্জেস করলেন :

‘স্ফটিকনির্মিত অই শোভিছে বিমান,  
 কুটাগাররাজি যার অতি মনোহর।  
 দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে;  
 অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যানুত্যাগানে  
 মুখরিত প্রকোষ্ঠ উহার,  
 চৌদিকে বেষ্টিয়া বহে নদী মনোরমা,  
 সুপুষ্পিত তরুরাজি শোভে তটে যার,  
 কপিখ-রাজায়তন জম্বু-আশ্র-শাল  
 তিন্দুক পিয়াল আদি নিত্যফলপ্রদ।  
 দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথ্যে,  
 হচ্ছি পুলকিত আনন্দে অপার  
 কি শুভকর্মের ফলে, বল ত আমায়।  
 ভূঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ঐ বিমানে।’

[মাতলি বললেন]—

‘মিথিলাপুরীতে, ভূপ, নরজন্মে ইনি  
 ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর।  
 করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,  
 নির্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু।  
 সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ  
 সরলস্বভাব শাস্ত্রচৈতা ঋষিদের  
 প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য  
 চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত,  
 চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,  
 প্রাতিহার্যপক্ষে আর পালিতেন তিনি  
 সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল; পোষধী হয়ে  
 সর্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।

সে সংযম, সেই দানমাহাশ্বে, রাজন্,  
ভুঞ্জন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।’

মাতলি এইরূপে উক্ত আটটি বিমানের পরিচয় রাজাকে দিচ্ছিলেন। এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁর বিলম্ব হচ্ছে দেখে অপর একজন দ্রুতগামী দেবপুত্রকে পাঠালেন। এই দেবপুত্রের মুখে শত্রুর আজ্ঞা শুনে মাতলি দেখলেন, আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি তখন যুগপৎ রাজাকে বহু বিমান দেখালেন এবং এই সকল বিমানবাসীরা কি পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করছেন, রাজা তা জিজ্ঞেস করলেন মাতলিকে —

‘অন্তরীক্ষে এই সব বিরাজে বিমান  
ভাস্বর, সুবর্ণময়, সহস্র সহস্র  
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা  
দেখে এসব আমি, হে দেবসারথ্যে,  
হচ্ছি পুলকিত আনন্দে অপার।  
কোন শুভ কর্মফলে দেবপুত্রগণ  
ভুঞ্জন বিমানে থাকি দিব্যসুখে এবে?’

[মাতলি বললেন]—

‘পাইয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষা যাঁরা নরলোকে  
সদ্ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, নৃগণি,  
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শাস্তা যে যে উপদেশ  
দিলেন, পালন সদা করিলেন যাঁরা  
অপ্রমত্তভাবে, সেই পুণ্যবানগণ  
এসব বিমানে বাস করেন এখন।’

রাজাকে এসব আকাশস্থ বিমানসমূহ প্রদর্শন করিয়ে মাতলি অতঃপর তাঁকে শক্রসকাশে গমন করবার জন্য উৎসাহিত করলেন—

‘পাপকর্মাদের যন্ত্রণা-আগার  
করিলেন নিরীক্ষণ,  
পুণ্যবান যাঁরা তাঁদেরও, রাজর্ষে,  
দেখিলেন নিকেতন।

চলুন সত্বর, করি গিয়া এবে দেবরাজে দরশন।’

এই বলে মাতলি পুরোভাগে রথ চালালেন এবং সুমেরুকে পরিবেষ্টন করে কটিবন্ধাকারে যে সাতটি পর্বত বিরাজমান আছে রাজাকে সেগুলো দেখালেন।

তদদর্শনে রাজা মাতলিকে যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা ব্যক্ত করার জন্য শাস্তা বললেন—

‘সহস্রতুরগযুক্ত সান্দনে আরাঢ় রাজা  
 স্বর্গধামে যাইবার কালে  
 সীদা-তোয়নিধি মাঝে দেখিলেন সবিস্ময়ে  
 মনোহর সপ্তকুলাচলে।  
 হেরি সে অপূর্ব দৃশ্য, কৌতূহল নিবারিতে  
 মাতলিকে শুধান নৃমণি—  
 এ সব পর্বতে কোনটি কি নাম ধরে,  
 দয়া করি বল, সুত, শুনি।’

[মাতলি বললেন]—

‘সুদর্শন, করবীক, ঈষাধর, যুগঙ্কর,  
 নেমিঙ্কর, বিনতক, অশ্বকর্ণ গিরিবর  
 উচ্চ হতে উচ্চতর এইসব পরপর  
 বিরাজে সোপানবৎ সীদা-বক্ষে কি সুন্দর!  
 চতুর্মহারাজ নামে বিদিত ভুবনে যাঁরা  
 এসব পর্বতে, ভূপ, বসতি করেন তাঁরা।’

রাজাকে চতুর্মহারাজিক দেবলোক দেখিয়ে মাতলি আবার রথ নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং ত্রয়স্ত্রিংশদভবনের ইন্দ্রের মূর্তিপরিবৃত চিত্রকূট নামক দ্বার-কোঠক দেখালেন। তা দেখেও রাজা প্রশ্ন করলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

‘স্বচিত্ত বিবিধরত্নে বিবিধবরণ  
 অই যে তোরণ শোভে পুরোভাগে মোর  
 ইন্দ্রের প্রতিমা বহু রয়েছে চৌদিকে  
 রক্ষিতে এ স্থান যেন। রক্ষে বনভূমি  
 অন্য সব পশু হতে শার্দূল যেমন।  
 নীরঞ্জঃ স্বর্গধামে, এই দ্বার দিয়া,  
 চলুন, প্রবেশ মোরা করিব এখন।’

‘এই কথা বলে মাতলি রাজাকে দেবনগরের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। কথিত আছে—

সহস্রতুরগযুক্ত সান্দন আরাঢ় রাজা  
 হতে হতে অগ্রসর।  
 দেখিলেন অবশেষে রয়েছে সম্মুখে সভা  
 ত্রিদশগণের মনোহর।

দিব্যযানস্থ রাজা যেতে যেতে সুধর্মা-নামক দেবসভা দেখে মাতলিকে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

‘সুনীল শরদাকাশসম মনোহর  
বৈদূর্যনির্মিত অই বিমান সুন্দর  
অপরূপ শোভা এর করি নিরীক্ষণ  
হইল আমার আজ সার্থক নয়ন।  
কি নামে বিদিত হয় এ চারু বিমান?  
কহ মোরে মাতলি।’

[মাতলি বললেন]—

‘এই সেই সুধর্মা-সভা ত্রিদশগণের  
বৈদূর্যনির্মিত চারু। আছে প্রতিষ্ঠিত  
শত শত সুগঠিত রত্নমুক্তাখচিত  
অষ্টকোণ স্তম্ভোপরি এ চারু বিমান।  
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বাসী যত দেবগণ হেথা  
ইন্দ্রকে অগ্রণী করি হয়ে সমাসীন  
চিন্তেন দেবতা আর মানবের হিত।  
এই পথে, হে রাজর্ষে, করুন প্রবেশ  
দেবগণপ্রিয় এই বিচিত্র সভায়।’

এদিকে দেবতারা রাজার আগমন-প্রতীক্ষায় সভাসীন হয়েছিলেন। তিনি এসেছেন শুনে তাঁরা দিব্য গন্ধপুষ্প হস্তে চিত্রকূট দ্বারকোষ্ঠক পর্যন্ত প্রত্যাগমন করলেন এবং মহাসম্বন্ধে গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করে সুধর্মা-সভায় নিয়ে গেলেন। রাজা রথ থেকে নেমে দেবসভায় প্রবেশ করলেন। দেবতারা সেখানে তাঁকে আসন গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান করলেন। শত্রুও রাজাকে আসন এবং দিব্য কাম্যবস্ত্রসমূহ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে শাস্তা বললেন—

“উপস্থিত দেখি তাঁরে দেবতারা সবে হস্তমনে  
করিলা অভিনন্দন সুমধুর স্বাগতবচনে :  
এস, হে রাজর্ষে, মোরা বড় সুখ পেলাম আজ।

শত্রু নিজে অভ্যর্থনা করলেন মিথিলানাথের,  
দিলেন আসন তাঁরে, আর যত সামগ্রী ভোগের।  
বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে—‘দেবলোকে তব আগমন  
হয়েছে, রাজর্ষে, আজ সাতিশয় সুখের কারণ



যত কাম্য বস্তু আছে সমস্তই তোমার আয়ত্ত  
ত্রয়দ্বিশদলোকে থাকি কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।”

শত্রু রাজাকে দিব্য কাম ভোগ করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু রাজা তা  
প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন—

‘যাক্কালাক যান আর যাক্কালাক ধন  
অপরের দস্ত সুখ তারই মতন  
পরদস্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই  
নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।  
তাহাই প্রকৃত সুখ নিজস্ব আমার  
পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।  
তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন  
করিব কুশল কর্ম বহু সম্পাদন।  
হইব সংযমী, দাণ্ড, দানশীল আর  
সেই সুখী, হয় যে হেন সদাচার।  
করে না এমন কর্ম সে জন কখনো  
অনুতাপানলে দক্ষ হয় যাতে মন।’

মহাসত্ত্ব এইরূপে মধুরস্বরে দেবতাদের নিকট ধর্মদেশনা করলেন। মনুষ্যাগণনায়  
এক সপ্তাহকাল তিনি দেবগণের প্রীতিসম্পাদনপূর্বক দেবসভায় মাতলির গুণকীর্তন  
করলেন এবং বললেন—

‘মাতলি সারথিবর করিলেন দয়াবশে  
উপকার প্রভূত আমার।  
দেখালেন ইনি মোরে পুণ্যাঙ্গাদিগের ধাম  
পাপীদের যন্ত্রণা-আগার।’

অতঃপর রাজা শত্রুকে সম্বোধন করে বললেন—‘মহারাজ, আমি এখন  
নরলোকে ফিরতে ইচ্ছা করি।’ শত্রু বললেন—‘সৌম্য মাতলে, তুমি তবে সত্ত্বর  
নেমি রাজাকে মিথিলায় নিয়ে যাও।’ মাতলি ‘যে আজ্ঞা’ বলে রথ সজ্জিত  
করলেন। রাজা প্রীতিপ্রমুখ বচনে দেবগণের নিকট বিদায় নিলেন এবং  
নিবর্তনপূর্বক রথে আরোহণ করলেন। মাতলি পূর্বাভিमुखে রথ চালিয়ে মিথিলায়  
উপনীত হলেন। নগরবাসীরা সকল দিব্যরথ দেখে তাঁদের রাজা ফিরে এলেন  
জেনে আহ্লাদিত হলেন। মাতলি মিথিলা প্রদক্ষিণ করে যে বাতায়ন থেকে  
সপ্তাহপূর্বে মহাসত্ত্বকে তুলে নিয়েছিলেন সেই বাতায়নেই তাঁকে নামিয়ে দিলেন  
এবং বিদায় নিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। অতঃপর বহুলোকে রাজাকে পরিবেষ্টন  
করে ‘দেবলোক কীদৃশ’ ইহা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা দেবগণের বিশেষতঃ

দেবরাজ শত্রুর দিব্যসম্পত্তি বর্ণনাপূর্বক বললেন : ‘তোমরাও দান কর, পুণ্যব্রত হও; এই সকল সংকর্ম করলে তোমরাও দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করবে।’

### দেবলোকে আয়ুষ্কাল

স্বর্গলোকে দেবগণের বর্ণনা দেওয়া অপূর্ণই থেকে যাবে যদি না বিভিন্ন স্বর্গের অধিবাসী দেবতাদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোকপাত করা না হয়।

চতুর্মহারাজিক দেবতাদের আয়ুষ্কাল হচ্ছে ৫০০ দিব্য বৎসর। মনুষ্য গণনায় ৯০ লক্ষ বৎসর, কারণ মনুষ্যগণের ৫০ বৎসরে দেবগণের এক দিব্যরাত্র হয়। ত্রয়স্বিত্বশব্দ দেবলোকের (অর্থাৎ দেবরাজ শত্রুর রাজ্য) দেবগণের আয়ুষ্কাল চতুর্মহারাজিক দেবগণ অপেক্ষা ৪গুণ বেশী অর্থাৎ তাঁদের আয়ু মনুষ্য গণনায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর (অর্থাৎ ৯০ লক্ষ × ৪)। যাম দেবলোকের দেবগণের আয়ুষ্কাল ত্রয়স্বিত্বশব্দ দেবলোকের দেবগণের আয়ুষ্কাল অপেক্ষা ৪গুণ বেশী অর্থাৎ তাঁদের আয়ু মনুষ্যগণনায় ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। তুষিত দেবলোকের দেবগণের আয়ুষ্কাল যাম দেবলোকের দেবগণের আয়ুষ্কাল অপেক্ষা ৪গুণ বেশী অর্থাৎ মনুষ্যগণনায় ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। নির্মাণরতি দেবলোকের দেবগণের আয়ুষ্কাল মনুষ্যগণনায় ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। পরনির্মিত কশবতী দেবলোকের দেবগণের আয়ু মনুষ্যগণনায় ৯২১ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর।

### ষোড়শ রূপব্রহ্ম

আমরা এখন ষোড়শ রূপব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করবো। রূপব্রহ্মের সংখ্যা ষোড়শ। যাঁরা রূপাবচর ধ্যানের মধ্যে প্রথম ধ্যান লাভ করবেন তাঁরা প্রথম তিনটি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। যেমন, ব্রহ্ম পারিসঙ্ক্জ, ব্রহ্ম পুরোহিত এবং মহাব্রহ্ম। ব্রহ্ম পারিসঙ্ক্জবাসীর আয়ুষ্কাল এক কল্পের তৃতীয়াংশ। ব্রহ্ম পুরোহিত-বাসীর আয়ুষ্কাল অর্ধকল্প। মহাব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল এক কল্প।

যাঁরা রূপাবচর ধ্যানের দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যান লাভ করবেন তাঁরা দ্বিতীয় তিনটি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। যেমন, পরিস্তাভ, অপ্রমাণাভ এবং আভাস্বর। পরিস্তাভ ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল দুই কল্প। অপ্রমাণাভ ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল চারি কল্প এবং আভাস্বর ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল আট কল্প।

যাঁরা রূপাবচর ধ্যানের চতুর্থ ধ্যান লাভ করবেন তাঁরা তৃতীয় তিনটি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। যেমন, পরিস্তসূভ, অপ্রমাণসূভ এবং সুভকিণ্হ। পরিস্তসূভ ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল ষোড়শ কল্প। অপ্রমাণসূভ ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল দ্বাত্রিংশ কল্প এবং সুভকিণ্হ ব্রহ্মবাসীর আয়ুষ্কাল চৌষষ্টি কল্প।

যাঁরা রূপাবচর ধ্যানের চতুর্থ ধ্যান লাভ করবেন তাঁরা বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকেও উৎপন্ন হবেন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল পঞ্চশত কল্প।

যাঁরা ধ্যানে উন্নত হয়েছেন তাঁরা রূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়েন্দ্রিয় সমন্বিত। কিন্তু চক্ষু এবং শ্রোত্র এই দুইটি ইন্দ্রিয়ই তাঁদের নিকট কার্যকরী হয়। কারণ তাঁরা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঋদ্ধিমান ঋষিদের ন্যায় অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্যজনক সত্ত্বগণকে দেখতে অভিলাষী। যেমন, বুদ্ধগণ, অর্হংগণ—যাঁরা মাঝেমধ্যে জগতে আবির্ভূত হন। তাঁদের মুখে ধর্মদেশনা শুনতেও তাঁরা আগ্রহী। যেহেতু তাঁদের ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা নেই, তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় এবং কায়েন্দ্রিয় তাঁদের নিকট অক্রিয় থাকে।

এতদ্ব্যতীত অসংজ্ঞসত্ত্ব আছেন, যাঁরা সংজ্ঞা বিরাগ ভাবনা করেন তাঁরাই অসংজ্ঞসত্ত্বরূপে অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তাঁদের আয়ুও ৫০০ কল্প। বেহপ্ফল এবং অসংজ্ঞসত্ত্ব এই দুইটি ব্রহ্মভূমি একই সারিতে অবস্থিত।

অসংজ্ঞসত্ত্বগণের শুধুমাত্র কায় থাকে অর্থাৎ শুধুমাত্র রূপ থাকে, যা উৎপন্ন হয় এবং চ্যুত হয়। মন বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁদের কোন বাসনা থাকে না, কারণ তাঁরা মনে করেন যে ‘মন’ই নানা সমস্যার সৃষ্টি করে যা সত্ত্বগণকে ভোগ করতে হয়। অতএব মন থেকে মুক্ত হতে পারলে পরলোকে তাঁদের আর কোন সমস্যা থাকবে না। মন থেকে মুক্ত হওয়া মানে মুক্তি, জীবন্মুক্তি। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম মতে ইহাও এক মিথ্যা দৃষ্টি। কারণ অন্যান্য ভূমির ন্যায় এই অসংজ্ঞসত্ত্বলোকেও সত্ত্বগণের মৃত্যু হয় যখন তাঁদের জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যালোকে মৃত্যুর সময় তাঁদের যে দেহভঙ্গি থাকে—অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থা, বসা অবস্থা, অথবা শায়িত অবস্থা—সেই দেহভঙ্গি নিয়ে অসংজ্ঞসত্ত্বগণ অসংজ্ঞসত্ত্বলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা চ্যুত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভঙ্গিতেই ৫০০ কল্প অতিবাহিত করেন।

(দ্র. মজ্জিমনিকায়ের মূলপরিয়ায়সূক্তের অট্টকথা)

অসংজ্ঞসত্ত্বলোকে উৎপত্তি নির্ভর করে চতুর্থ ধ্যান লাভ করার উপর। অর্থাৎ চতুর্থ ধ্যান লাভ করার পরে এই অসংজ্ঞসত্ত্বলোকে জন্ম নেবার জন্য মনোনিবেশ করতে হয়। সাধারণতঃ যাঁরা উন্নত শ্রেণীর যোগী তাঁরাই এই সত্ত্বলোক কামনা করেন। কারণ তাঁদের মতে মনই সমস্ত দুঃখের কারণ। কজেই যদি তাঁরা মন থেকে মুক্ত হতে পারেন, দুঃখ থেকেও তাঁরা মুক্তি পাবেন। অতএব চতুর্থ ধ্যান থেকে যোগী অন্তর্মুখী সাধনা করে দেহকে মন থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে অসংজ্ঞব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং ৫০০ কল্পাবধি সেখানে অবস্থান

করেন। কিন্তু কর্মানুসারে তাঁদেরও চ্যুতি হয় ৫০০ কল্প পরে এবং অন্য কোন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন।

আমি এখানে বলতে চাই যে, চতুর্থ ধ্যান হচ্ছে পদক-ধ্যানের উৎপত্তিস্থল। অর্থাৎ ষড়ভিঙ্গা লাভের উৎসস্থল হচ্ছে এই পদক-ধ্যান। অভিধর্মে অবশ্য চারি রূপধ্যানের স্থলে পাঁচটি রূপধ্যানের কথা বলা হয়েছে। তার কারণ তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্যান সুত্তপিটকের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানের সমতুল।

### পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক

পূর্বোক্ত একাদশ ব্রহ্মলোক ছাড়াও ৫টি শুদ্ধাবাস আছে। তাই সর্বসাকুল্যে ব্রহ্মলোকের সংখ্যা ১৬ (১১ + ৫)। এই পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি নির্ভর করে ধ্যানের প্রগতির উপর। যাঁরা বৌদ্ধ লোকোত্তর মার্গের মধ্যে ‘অনাগামী’ স্তর লাভ করেছেন তাঁদের জন্যই এই শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক। অনাগামী এই শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের যে কোন একটিতে অবস্থান করে অর্হন্ত লাভ করেন এবং সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁদের আর মনুষ্যালোকে ফিরে আসতে হয় না। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এর যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনাগামী কোনো একটি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক হচ্ছে—

১। অবিহ, ২। আতপ্প, ৩। সুদস্স, ৪। সুদস্সী এবং ৫। অকনিট্ঠ।

১। অবিহ—ষোলো প্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে দ্বাদশতম রূপব্রহ্মলোকের নাম। রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে পঞ্চ শুদ্ধাবাস রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মভূমি। ইহা অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্রহ্মলোক থেকে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে অবস্থিত। অবিহ ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু সহস্র কল্প।

২। আতপ্প—অবিহ থেকে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে আতপ্প শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক অবস্থিত। আতপ্প ব্রহ্মবাসীর আয়ু দুই সহস্র কল্প।

৩। সুদস্স—আতপ্প থেকে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে সুদস্সী শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক অবস্থিত। সুদস্স ব্রহ্মবাসীর আয়ু চারি সহস্র কল্প।

৪। সুদস্সী—সুদস্স থেকে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে সুদস্স শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক অবস্থিত। সুদস্সী ব্রহ্মবাসীর আয়ু অষ্ট সহস্র কল্প।

৫। অকনিট্ঠ—সুদস্সী শুদ্ধাবাস থেকে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে অকনিট্ঠ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক অবস্থিত। এই অকনিট্ঠ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মবাসীর আয়ু ষোড়শ সহস্র কল্প।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, যারা 'অনাগামী' স্তর লাভ করেছেন, তাঁদের জন্যই এই শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক। অস্তুরা, উপহচ্চ, উদ্ধংসোত, অসম্ভার এবং সসম্ভারভেদে অনাগামীর পরিনির্বাণ লাভ পঞ্চস্তরে বিভাজিত। অকনিট্ঠ ব্রহ্মলোকে উদ্ধংসোত পরিনির্বাণী নেই। অবিহ, আতপ্প, সুদস্স এবং সুদস্সী এই সকল শুদ্ধাবাসভূমিতে দশ প্রকার হিসাবে ৪০ প্রকার (১০ × ৪) অনাগামী ও অকনিট্ঠ শুদ্ধাবাসে ৮ প্রকার অনাগামী। অতএব সবশুদ্ধ ৪৮ প্রকার (৪০ + ৮) অনাগামীর বিভাগ অভিধর্মে বর্ণিত হয়েছে। ধ্যানের গুরুত্বভেদে এই স্তরগুলি বিভাজিত।

### ষোড়শ ব্রহ্মলোকের সংজ্ঞা

- ১। ব্রহ্মপারিসঙ্ক — মহাব্রহ্মার সভাসদের নামান্তর ব্রহ্মপারিসঙ্ক।
- ২। ব্রহ্ম পুরোহিত — মহাব্রহ্মার পুরোভাগে অবস্থিত বিধায় ব্রহ্মপুরোহিত।
- ৩। মহাব্রহ্ম — বহু সহস্র একচারী ব্রহ্মের নিবাস মহাব্রহ্ম।
- ৪। পরিস্তাভ — দেহাভা সসীম বিধায় পরিস্তাভ।
- ৫। অপ্রমাণাভ — দেহাভা অসীম বিধায় অপ্রমাণাভ।
- ৬। আভাস্বর — দেহজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় বলে আভাস্বর।
- ৭। পরিস্তসুভ — ঘনীভূত অচলরশ্মিপুঞ্জ অল্প বিধায় পরিস্তসুভ।
- ৮। অপ্রমাণসুভ — অপ্রমাণ রশ্মি বিধায় অপ্রমাণসুভ।
- ৯। সুভকিংহ — রশ্মি আকীর্ণ বিধায় সুভকিংহ।
- ১০। বেহপ্ফল — উপেক্ষা ধ্যান বলে উৎপন্ন বিধায় অভিবর্ধিত বিপুল পুণ্যফলের অধিকারী বলে বেহপ্ফল।
- ১১। অসংজ্ঞসত্ত্ব — সংজ্ঞা বিরাগ ভাবনায় উৎপন্ন বিধায় অসংজ্ঞসত্ত্ব।
- ১২। অবিহ — শুদ্ধমনা অনাগামী অল্পকাল মধ্যে স্থান ত্যাগ করেন বিধায় অবিহ।
- ১৩। আতপ্প — চিন্তা পরিদাহ বিসর্জন কারণে আতপ্প।
- ১৪। সুদস্স — প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণে সুষ্ঠুভাবে দর্শন করেন বলে সুদস্স।
- ১৫। সুদস্সী — প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা সুষ্ঠুতর ভাবে দর্শন করেন বিধায় সুদস্সী।
- ১৬। অকনিট্ঠ — রূপ ব্রহ্ম ও অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হেতু কনিষ্ঠ নয় এই অর্থে অকনিট্ঠ।

## চারি অরূপ ব্রহ্মলোক

অবশেষে আমরা চারি অরূপ ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই অরূপ ব্রহ্মলোকে শুধু মন আছে। কোন রূপকায় নেই। সেইজন্য এই ব্রহ্মলোককে বলা হয় ‘অরূপ ব্রহ্মলোক’। অসংজ্ঞাসত্ত্বলোকের সত্ত্বগণ মনে করেন যে মনই সমস্ত দুঃখের কারণ। তাই তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে রূপকায় থেকে মনকে পৃথক করে অসংজ্ঞাসত্ত্বলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অরূপ ব্রহ্মলোকের ক্ষেত্রে তার বিপরীত। এই অরূপ ব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণ মনে করেন যে, রূপকায়ই সর্বদুঃখের কারণ, তাই তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে রূপকায়কে মন থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেন এবং অরূপ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

অরূপ ব্রহ্মলোক চার প্রকার।

১। আকাশানন্ত্যায়তন — যার অন্ত নেই অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই তাই অনন্ত। আকাশ উৎপত্তি ও বিলয়হীন বলে আকাশও অনন্ত। এই অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাই আকাশানন্ত্যায়তন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ২০ সহস্র কল্প।

২। বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন—বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় আছে এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত হলেও অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করাতে একে অনন্ত বলা হয়েছে। অনন্ত বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাই বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ৪০ সহস্র কল্প।

৩। আকিঞ্চন্যায়তন — অরূপধ্যানী যোগী মনে করেন এই অনন্ত চিত্তও ‘কিছু না’, ইহার ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ ইহা অবিদ্যমান। অকিঞ্চনের যে ভাব তা আকিঞ্চন্য নামে অভিহিত। সর্বশূন্যতা। ‘কিছু না’ বা ‘কিছু নেই’ এই ভাবনাকে অবলম্বন করে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাকে বলে আকিঞ্চন্যায়তন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ৬০ সহস্র কল্প।

৪। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন — নৈবসংজ্ঞা — নাসংজ্ঞা। অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যেই অবস্থায় বেদন (অথবা সংজ্ঞা অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি) নেই অথবা বেদন নেই তাও নয়, এমন একটি অবস্থা যেই অবস্থায় চেতনা (বা আত্মজ্ঞান) আছে এমনও নয় কিংবা চেতনা নেই এমনও নয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞার স্তর বা অবস্থাবিশেষ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন যা অরূপ ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বতম ৪র্থ স্তর বা অবস্থা। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ুষ্কাল ৮০ সহস্র কল্প।

কথিত আছে যে, সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রথম গুরু ঋষি আড়ার কালাম

‘আকিঞ্চন্যাতন’ স্তর অবধি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় গুরু উদ্দক রামপুত্র ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাতন’ অবধি আয়ত্ত করেছিলেন।

এই অরূপ ব্রহ্মলোক সমূহে আছে শুধু মন, রূপ নেই—রূপের যে চার মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবীধাতু, অব্ধাতু, তেজোধাতু এবং বায়ুধাতু সেখানে নেই। বৌদ্ধশাস্ত্রে এজাতীয় অরূপ ব্রহ্মলোকের অস্তিত্ব যে সম্ভব তা বর্ণিত হয়েছে। যদি একটি লোহার রডকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, ইহা শূন্যে ভাসতে থাকে যতক্ষণ এর মধ্যে শূন্যে ভেসে থাকার শক্তি ফুরিয়ে না যায়; ঠিক তদ্রূপ অরূপ-ধ্যানের মাধ্যমে মনের শক্তিকে জাগ্রত করে অরূপ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যোগীকে পৌঁছে দেয়। অবশ্য এটা মন এবং রূপের ক্ষণিকের বিচ্ছেদমাত্র, যতক্ষণ না যে ধ্যানের বল তাঁদেরকে ঐ অরূপ লোকে পৌঁছে দিয়েছে তা নিঃশেষিত না হয়ে যায়।

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, ষোড়শ ব্রহ্মলোক এবং চার অরূপ ব্রহ্মলোক থেকে চ্যুত হয়ে কোন দেবতা সরাসরি অপায়লোকে উৎপন্ন হন না। তাঁরা চ্যুত হয়ে প্রথমে মনুষ্যালোকেই জন্ম নেন। তারপরে অপায়লোকে জন্ম নেবার মতো গর্হিত কোন কর্মের ফল থাকলেই তাঁরা অপায়লোকে জন্ম নেয়, নতুবা নয়।

আমি এই অধ্যায়ের ইতি টানতে চাই এই কথার উপর জোর দিয়ে যে উচ্চস্তরের ঋদ্ধিমান যোগীরা অরূপ-ব্রহ্মলোকে জন্ম নিতে ইচ্ছুক হন যেহেতু তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের এই নশ্বর দেহই হচ্ছে যত দুঃখের কারণ। তাঁরা যদি রূপ দেহ থেকে মুক্ত হতে পারেন, তা হলে তাঁরা মুক্ত হবেন এবং প্রকৃত সুখ ভোগ করতে পারবেন। সেই একই কারণে সাধারণ মানুষ যখন মনুষ্যালোকে সত্যিকার সুখ ভোগ করতে পারেন না, তাঁরা দেবলোকে জন্মগ্রহণ কামনা করেন। দেবলোকেও প্রকৃত ও শাস্ত্রত সুখ না পেলে তাঁরা ঋষিজীবন যাপন করে ধ্যান-সাধনায় উদ্যোগী হন এই কামনা করে যে, তাঁরা ব্রহ্মলোক, অরূপ ব্রহ্মলোক বা অসংজ্ঞাসত্ত্বলোকে জন্মগ্রহণ করবেন যেখানে যথার্থ স্থায়ী সুখের অধিকারী তাঁরা হবেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁরা সুখ ভোগ করবেন— সব চেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী দেবলোক হচ্ছে চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মলোক যেখানে আয়ুষ্কাল হচ্ছে ৮৪,০০০ কল্প। বলা যায় অনন্তকাল। তাঁরা মনে করেন মুক্তির চরম লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছে গেছেন।

কিন্তু ভগবান বুদ্ধই সর্বপ্রথম বলেছেন যে, যে কোন দেবলোক, ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেই দেবলোক বা ব্রহ্মলোক যত উঁচু বা দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন—সেই দেবলোক বা ব্রহ্মলোক অনিত্য, শাস্ত্রত বা নিত্য নয়। পুণ্যফলের ভোগ শেষ হলে আবার মর্ত্যালোকে ফিরে আসতে হবে। তীব্র পাপকর্মের ফলের ভোগ বাকী

থাকলে অপায়লোকেও জন্ম হতে পারে। তাই বুদ্ধের অনুশাসন হচ্ছে পুনর্জন্মকে রোধ করতে হবে এবং নির্বাণলাভের মাধ্যমে দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাই বুদ্ধের অমৃতবাণী হচ্ছে ‘পুনর্জন্মকে রোধ কর।’

৩১ প্রকার সত্ত্বলোক যা উপরে বর্ণিত হয়েছে :

১।	ব্রহ্মলোক	১৬
২।	অপায় লোক	৪
৩।	সুগতি লোক	৭
৪।	অরূপ ব্রহ্মলোক	৪

৩১ (একত্রিংশৎ সত্ত্বলোক)

## সংশয়বাদী

সর্বযুগে সর্বকালে সংশয়বাদী থাকে। দু’টি ঘটনার অবতারণা করে এই ক্ষুদ্র গবেষণাপত্রের ইতি টানছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মনুষ্যলোক ব্যতিরেকে পরলোকের কথা যা পায়সি রাজন্য এবং ভিক্ষু কুমার কস্সপের কথোপকথনে পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যটি দেবগণের তুলনায় মনুষ্যগণ কত স্বল্পায়ু—এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে মালা-পরিধানকারী দেবতার কাহিনীতে।

একদিন সংশয়বাদী রাজা পায়সি ভিক্ষু কুমার কস্সপের নিকট এসে বলে ন—  
‘হে কস্সপ, আমি মনে করি পরলোক নেই, সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলও নেই।’

কুমার কস্সপ বললেন : ‘হে রাজপুত্র, এমন কোন প্রমাণ আছে কি যে, সেগুলো নেই?’

‘হে কস্সপ, প্রমাণ আছে। আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন যাঁরা প্রাণ বধ করতেন, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ বরতেন, ব্যভিচার করতেন। মিথ্যাভাষী ছিলেন, পিশুন ও পরুষ বাক্য উচ্চারণ করতেন। তুচ্ছ প্রলাপে রত হতেন। যাঁরা লোভযুক্ত, দ্বেষযুক্ত এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কোন সময়ে তাঁরা রোগগ্রস্ত হয়ে দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হলে যখন আমি শুনেছি তাঁদের আরোগ্যলাভের আশা নেই তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়ে এইরূপ বলেছি : ‘মহাশয়গণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য যদি সত্য হয়, আপনারা যাঁরা শীল পালন করেননি মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হবেন। মহাশয়গণ, মৃত্যুর



পর যদি আপনারা ঐরূপ দশাগ্রস্ত হন, তা হলে আমার নিকট এসে বলবেন : পরলোক আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এসে আমাকে কিছু বলেননি, কোন দূতও প্রেরণ করেননি। হে কস্‌সপ, এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝতে পারি পরলোক নেই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নেই।’

কুমার কস্‌সপ বললেন : ‘রাজপুত্র, আপনি কি মনে করেন? মনে করুন আপনার কর্মচারিগণ কোন কুক্রিয়াসক্ত চোরকে ধরে এনে বললেন — ‘দেব, এই পুরুষ কুক্রিয়াসক্ত চোর, আপনি ইচ্ছানুরূপ দণ্ডবিধান করুন।’ আপনি বললেন— ‘তা হলে এর বাহুদ্বয় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদিকে উত্তমরূপে বেঁধে, শির মুণ্ডিত করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে এর শিরচ্ছেদ কর। হে রাজপুত্র, বধ্যভূমিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে ধরুন সে ব্যক্তি বলল—‘মহাশয়গণ, অমুক গ্রামে বা নিগমে আমার বন্ধু-বান্ধব ও রক্তের সম্পর্ক বিশিষ্ট জ্ঞাতিগণ আছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাদের দেখে ফিরে আসব।’ তাকে কি অনুমতি দেওয়া হবে?’

পায়াসি উত্তর দিলেন : ‘ঘাতকগণ সরাসরি তার শিরচ্ছেদ করবে।’

কুমার কস্‌সপ বললেন—‘হে রাজপুত্র, সেই চোর মনুষ্য হয়েও যদি মনুষ্যভূত ঘাতকগণের নিকট ঐরূপ অনুমতি লাভ না করে, তা হলে কিরূপে আপনার পূর্বোক্তরূপ মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ মরণান্তে দুর্গতিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে আপনাকে দর্শন করার জন্য নরক-পালগণের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হবে? তাহলে এটা একটা প্রমাণ যে, পরলোক আছে এবং সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল আছে।’

‘কিন্তু শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আমি পূর্বে যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা আমার পাপী ও অসৎ বন্ধু মাত্র। আমার সৎ বন্ধুও আছেন যাঁরা সব সময় শীল পালন করেন (কোন প্রকার অন্যায় কাজ করেন না—কায়ের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা) তাঁদেরকেও আমি বলেছিলাম—যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয় যে আপনাদের মৃত্যুর পর সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবেন, তা হলে নিশ্চয়ই আপনারা সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোক উৎপন্ন হবেন, যেহেতু আপনারা শীল পালন করেন। মৃত্যুর পরে আপনারা বাস্তবিকই যদি ঐরূপ দশাপ্রাপ্ত হন, তাহলে আমার নিকট এসে বলবেন : পরলোক আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, তাঁরা এসে আমাকে কিছু বলেননি, কোন দূতও প্রেরণ করেননি। শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝতে পারি পরলোক নেই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নেই।’

‘তা হলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিচ্ছি। হে রাজপুত্র, মনে করুন কোন পুরুষ মলকূপে আশীর্ষ নিমগ্ন। আপনার আদেশে কোন ব্যক্তি এসে তাকে মলকূপ থেকে উদ্ধার করল। ব্রাশ দিয়ে তার দেহ মার্জিত করল। পাণ্ডুমুস্তিকা দিয়ে তার দেহ তিনবার শ্যাম্পু করে দিল (= ঘষে দিল)। তারপর তৈলমর্দন করে তিনবার স্নান করাল। কেশবিন্যাস করল, মহার্ঘ মাল্য, বিলেপন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করল। তারপর তাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা তার সেবা করল। হে রাজন্ পায়াসি, আপনি কি মনে করেন? সেই সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মাল্যাভরণভূষিত, শুভবস্ত্র পরিহিত, প্রাসাদস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্যদ্রব্যাদির দ্বারা সেবিত পুরুষটি কি পুনরায় সেই মলকূপে নিমগ্ন হতে চাইবে?’

‘মাননীয় কস্‌সপ, সে তা চাইবে না।’

‘কি কারণে?’

‘মাননীয় কস্‌সপ, মলকূপ অশুচি, দুর্গন্ধময়, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষকরূপে ঐ ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত।’

‘হে রাজন্, এইরূপেই মনুষ্যগণ দেবগণের নিকট অশুচি। শত যোজন দূর হতে মনুষ্যগণ দেবগণকর্তৃক অনুভূত হয়। আপনার ঐ সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ আজীবন শীল পালন করে মৃত্যুর পর যারা সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন, তাঁরা অশুচি মনুষ্যালোকে এসে আপনাকে বলবেন—‘পরলোক আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে’?’

‘রাজন্, আপনি চিন্তা করুন মনুষ্যগণনায় যেখানে একশত বৎসর দেবতাদের নিকট তা এক দিবারাত্রি মাত্র। ঐরূপ ত্রিংশতি দিবারাত্রিতে এক মাস, ঐরূপ মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর।

আপনার যে সকল মিত্র-অমাত্য ও জ্ঞাতিগণ স্বর্গলোকে আছেন তাঁরা যদি মনে করেন ‘আমরা দুই বা তিন দিবা-রাত্রি দিব্য পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তুতে লিপ্ত ও লীন হয়ে বিহার করে নিই। পরে আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া জ্ঞাপন করব : পরলোক আছে, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল আছে।’ তারা কি করে একথা আপনাকে জ্ঞাপন করবে? ইতিমধ্যে তো আপনার মরে যাবার কথা।’

বিভিন্ন স্বর্গলোকের আয়ুষ্কালের তুলনায় মনুষ্যালোকের আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত অল্প—এই বিষয় আরও একটি কাহিনীতে পাওয়া যায় (ধর্ম্মপদট্টকথা, শ্লোক ৪৮ এর অট্টকথা)।

অতীতে ত্রয়স্বিংশ দেবলোকে মালভারী নামক দেবপুত্র একদিন অঙ্গরা-সহস্র

পরিবৃত হয়ে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। পঞ্চাশত দেবকন্যা বৃক্ষে আরোহণ করে পুষ্প পাতিত করছে, অন্য পঞ্চাশত দেবকন্যা পতিত পুষ্পসমূহকে নিয়ে দেবপুত্রকে অলঙ্কৃত করছে। তাদের মধ্যে একজন দেবকন্যা বৃক্ষশাখায় বসে পুষ্প চয়ন করার সময় সেখানেই চ্যুত হয়ে দীপশিখার ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলগৃহে মাতৃকুক্ষিতে এসে জাতকালে জাতিস্মর হয়ে বলল— ‘আমি মালভারী দেবপুত্রের ভার্যা’ এবং প্রত্যহ তার সেই প্রাক্তন দেবপুত্র স্বামীর উদ্দেশ্যে মাল্যগন্ধাদি পূজার্ঘ্য দিয়ে প্রার্থনা করত সে যেন আবার তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃকালে তার বিবাহ হয় এবং যথাকালে চার সন্তানের জননী হয়। কিন্তু সে তার প্রাক্তন দেবপুত্র স্বামীকে ভুলতে পারে না এবং তার উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ্য নিবেদন করে প্রায়ই তার কথা বলতো। লোকেরা মনে করত যে সে হয়ত তার বর্তমান পার্থিব স্বামীর কথাই বলছে। কিন্তু তার মনপ্রাণ সর্বদা ঐ মালভারী দেবপুত্রের মধ্যেই নিহিত থাকত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন মালভারী দেবপুত্রের নিকট জন্মগ্রহণ করল।

দেবপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন : ‘তোমাকে সকাল থেকেই দেখছি। কোথায় গিয়েছিলে?’

‘স্বামিন্, আমি (দেবলোক থেকে) চ্যুত হয়েছিলাম।’

‘কি বলছো?’

‘হ্যাঁ স্বামিন্, ঠিক তাই।’

‘কোথায় জন্ম নিয়েছিলে?’

‘শ্রাবস্তীতে এক কুলগৃহে।’

‘সেখানে কত দিন ছিলে?’

‘দশ মাস পরে মাতৃকুক্ষি থেকে নির্গত হয়ে ষোড়শ বৎসর বয়ঃকালে অন্য পরিবারে আমার বিবাহ হয় এবং আমি চারটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আপনাকেই সর্বদা প্রার্থনা করে আপনার নিকটই পুনরায় ফিরে এসেছি, স্বামিন্।’

‘মনুষ্যদের আয়ু কত?’

‘মাত্র একশত বৎসর।’

‘এইটুকু মাত্র?’

‘হ্যাঁ স্বামিন্।’

‘এতটুকু আয়ু নিয়ে জন্ম নিয়ে মনুষ্যেরা সুপ্ত, প্রমত্ত হয়েই দিন কাটায়, না দানাদি পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে?’

‘স্বামিন্, কি বলছেন? মনুষ্যেরা সদাই প্রমত্ত যেন তারা অসংখ্য বৎসর আয়ু লাভ করেছে, যেন তারা অজর, অমর।’

একথা শুনে মালভারী দেবপুত্রের সংবেগ উৎপন্ন হল—‘একশত বৎসর আয়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যেরা নাকি প্রমত্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটায়। তারা কবে দুঃখ থেকে মুক্ত হবে? একশত বৎসর! শুধু একশত বৎসর! মনুষ্যেরা কত নির্বোধ!’

---